দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর হিন্দু জাতীয়তার প্রখর প্রবক্তা— পৃঃ ৩৫

প্রকাশের আগেই নিষিদ্ধ যে বই — পৃঃ ১৭

৭৮ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা।। ১ জুন, ২০২৬।। ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

বীর সাভারকর

- মহান দেশপ্রেমিক, আপোশহীন বিপ্লবী, হিন্দুত্বের প্রখর প্রবক্তা
- বিদেশে থেকেও ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের কাজ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে লন্ডনে তৈরি করেন 'অভিনব ভারত' নামক সংগঠন।
- তাঁর লেখা বই 'The Indian War of Independence 1857' প্রকাশের আগেই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

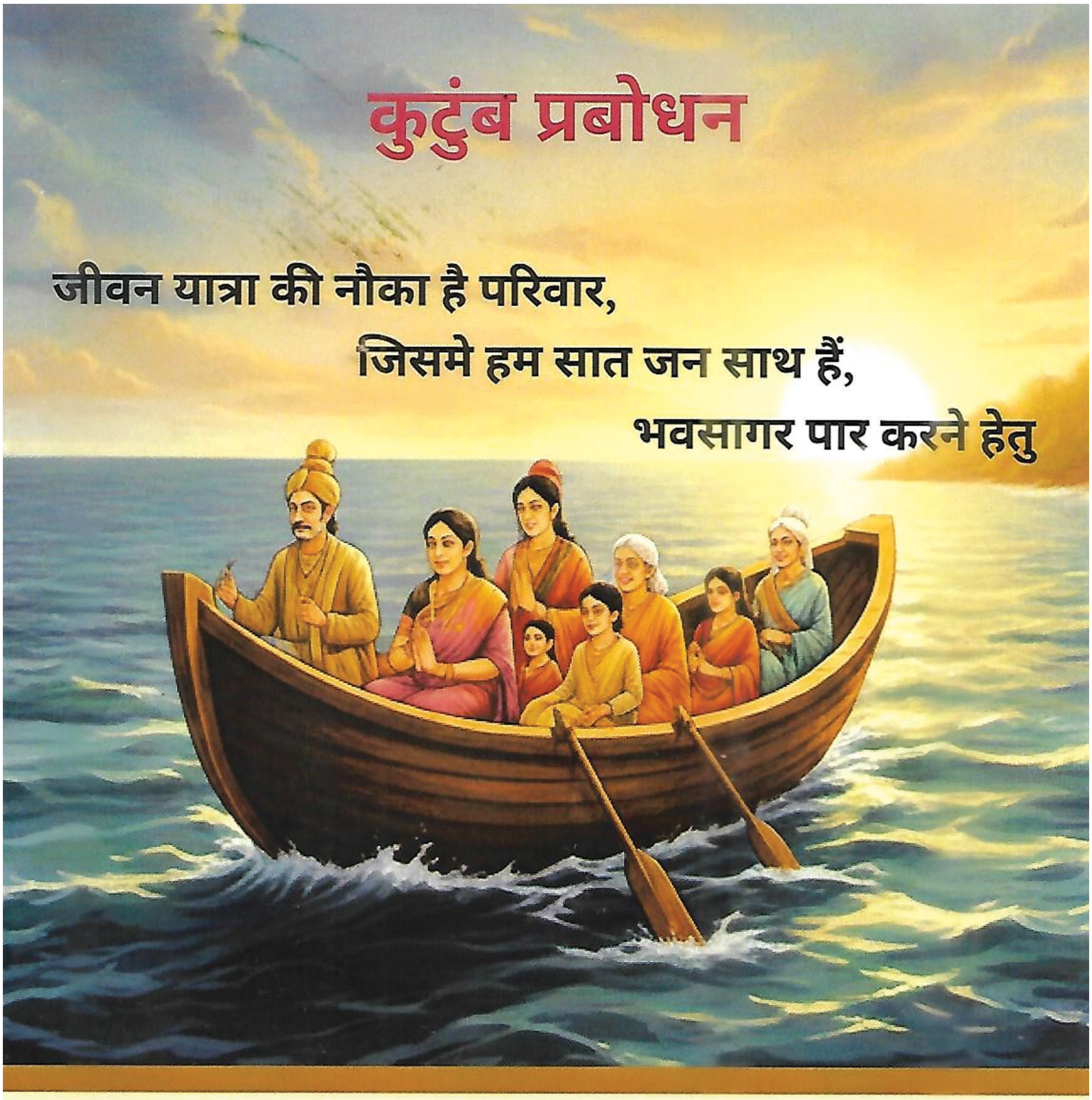

लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৪০ সংখ্যা, ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

১ জুন - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

সিউডো সেকুলারিজম আর জেহাদি মোল্লাবাদ রাজ্যের সাংস্কৃতিক জাগরণকে রুদ্ধ করে রেখেছিল : সাংস্কৃতায়ন ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ভারত-ইতালি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ◻ নরেন্দ্র মোদী ◻ ৭

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকটের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়েছে ভারত সরকার ◻ কৌটিল্য ◻ ৯

স্বখাত সলিলে ডুবেছেন তৃণমূলনেত্রী, ডুবিয়েছেন রাজ্যটিকেও ◻ প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য ◻ ১১

মন বদলালো পশ্চিমবঙ্গ : বঙ্গ রাজনীতিতে ফিরে আসুক সুস্থ পরিবেশ ◻ কনক চৌধুরী ◻ ১৩

অখণ্ড ভারতের অস্তিত্ব এবং পাকিস্তান বিরোধিতা প্রসঙ্গে বীর সাভারকর ◻ সৈকত নিয়োগী ◻ ১৫

প্রকাশের আগেই নিষিদ্ধ যে বই ◻ গৌতম কুমার মণ্ডল ◻ ১৭

উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ◻ ২৩

বিজ্ঞান সাধনায় প্রাচীন ভারতবর্ষ ◻ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় ◻ ৩১

বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর হিন্দু জাতীয়তার প্রখর প্রবক্তা ◻ ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি ◻ ৩৫

মহিলাদের সম্মান রক্ষা করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৩৮

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানায়কদের বিচারের অভিঘাতেই ভারত ছেড়ে পালিয়েছিল ইংরেজ ◻ প্রণব দত্ত মজুমদার ◻ ৪৩

ভারতের কমিউনিস্ট চরিত্র ◻ তারক সাহা ◻ ৪৭

রাতের অন্ধকারে ‘অপারেশন সানশাইন’ মনে আছে তো কমরেড? ◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৪৮

গল্প কথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ ◻ খেলা : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ পরিক্রমা ◻ ৪৯

ফঃ ১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৮ জুন
২০২৬

প্রকাশিত হবে
৮ জুন
২০২৬

পশ্চিমবঙ্গে সুশাসনের সূত্রপাত

পশ্চিমবঙ্গে সদ্য গঠিত রাজ্য মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণের পর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজ্যে সুশাসন ও সামগ্রিক উন্নয়নের সূত্রপাত হয়েছে। ইতিমধ্যেই নতুন সরকার রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ও নাগরিক পরিষেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় রাজ্যের নতুন সরকারের সামগ্রিক কাজকর্ম এবং আগামী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫   ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693   IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ইতিহাসের নির্লজ্জ বিকৃতি

স্বাতন্ত্র্যবীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরের জ্বলন্ত দেশপ্রেম, আপোশহীন সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে তাঁহার আমৃত্যু সংগ্রাম — সমগ্র বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষের নিকট তাঁহাকে প্রেরণার আলোকবর্তিকা রূপে চিহ্নিত করিয়াছে। তিনি জীবনের প্রারম্ভিক কালেই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশ ও বিদেশের মাটিতে রচনা করিয়াছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবের এক নবতম অধ্যায়। তাঁহার সমগ্র জীবন ভারতের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উত্থানের জন্য সংগ্রাম, সংঘাত, কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের এক অনন্য উদাহরণ। ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিপ্লবীদিগের প্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের মাটিতে বসিয়াই তিনি রচনা করিয়াছিলেন 'দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার অব ইন্ডিপেন্ডেন্স ১৮৫৭'। ব্রিটিশ শাসকের দৃষ্টিতে ওই পুস্তক উসকানিমূলক বিবেচিত হইয়াছিল। তাই পুস্তকটি প্রকাশের পূর্বেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও পুস্তকটি অত্যন্ত গোপনীয়তার সহিত প্রকাশিত হইয়া দেশ-বিদেশের বিপ্লবীদিগের হাতে হাতে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। পুস্তকটি এতই প্রেরণামূলক যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিকদিগের নিত্যপাঠ্য হিসাবে বিবেচিত করিয়াছিলেন। ব্যারিস্টারি পড়িতে যাইয়া লন্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা এবং রাষ্ট্রবোধ জাগরণের নিমিত্ত 'ফ্রি ইন্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপন করিয়া ভারতে ব্রিটিশ অপশাসনের প্রতিবাদে সক্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহারই মন্ত্রশিষ্য মদনলাল ধিংড়া লন্ডন শহরে প্রকাশ্য সভায় কার্জন ওয়াইলিকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রকার বৈপ্লবিক কার্যকলাপে প্রমাদ গোনে ব্রিটিশ সরকার। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ভারতে আনিয়া দুই দফার অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া আন্দামানের সেলুলার জেলের কালকুঠুরিতে বন্দি রাখিয়াছিল। চৌদ্দ বৎসর অমানুষিক কারাদণ্ড ভোগ করিয়াও তিনি শুধুমাত্র দেশের জন্য বাঁচিয়া ছিলেন। জেলখানায় জেল কর্তৃপক্ষের নির্মম নির্যাতন এবং জেহাদি কয়েদিদের নানাপ্রকার অত্যাচারের মুখে তিনি হিন্দু বন্দিদিগের মনোবল অটুট রাখিবার চেষ্টা করিতেন। ১৯২৪ সালের ৬ জানুয়ারি তিনি সেলুলার জেল হইতে মুক্তিলাভ করিলেও ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তাঁহাকে গৃহবন্দি রাখা হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালে তিনি সম্পূর্ণ রূপে মুক্তিলাভ করেন। তিনি শুধুমাত্র একজন প্রখর বিপ্লবীই ছিলেন না, ছিলেন সমাজ সংস্কারক এবং হিন্দুত্বের প্রবক্তা। রত্নগিরি জেলে অবস্থানকালে তিনি 'হিন্দুত্ব' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি অখণ্ড সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিচয়ে হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করিবার কথা বলিয়াছেন। তিনি হিন্দু সমাজের কুপ্রথা ও কুরীতির তীব্র বিরোধী ছিলেন। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে তাঁহার ভূমিকার কথা অদ্যাবধি মহারাষ্ট্রের মানুষ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করেন। তিনি জাতপাতহীন হিন্দু সমাজের পক্ষপাতী ছিলেন।

এহেন বিপ্লবী, দেশপ্রেমিক, সমাজ সংস্কারক, দেশমাতৃকার বীর সন্তানের আত্মত্যাগের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া এই দেশের কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা অনবরত তাঁহার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিয়াছে। ইতিহাসের জ্ঞান যাহাদের সীমিত, ক্ষমতার লোভ যাহাদের সীমাহীন, তাহারা আর যাই হোন সাভারকরের ন্যায় দেশপ্রেমিক তথা স্বাধীনতা যোদ্ধার মূল্যায়ন করিতে পারিবেন না। মার্জনা ভিক্ষাকারী বলিয়া তাঁহাকে যে অপবাদ দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা আসলে বন্দিনীতি উল্লঙ্ঘনের এক মহাদলিল। মার্জনা ভিক্ষা যে তাঁহার একটি কৌশল, যে কৌশলের উদ্দেশ্য ছিল যেনতেনপ্রকারেণ মুক্তিলাভ। তাহার পর পুনরায় দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের কার্যে লাগিয়া পড়া— তাহা অনুভব করিবার চেষ্টা কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা কোনোদিন করেন নাই। তাঁহার সেই মার্জনাভিক্ষার মূল্য যে শুধুমাত্র দেশপ্রেম, তাহা দেশ ও জাতির পক্ষে অবমাননাকর নহে, তাহা ভণ্ড দেশপ্রেমিক কংগ্রেস এবং দেশদ্রোহী কমিউনিস্টরা স্বীকার করিবেন কী করিয়া? তাঁহার মার্জনা ভিক্ষার বয়ানটি স্বয়ং গান্ধীজীই যে লিখিয়া দিয়াছিলেন, একথা তাহারা ভুলিয়া যান কীভাবে? প্রখ্যাত বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল তাঁহার আত্মজীবনী 'বন্দি জীবন' পুস্তকে লিখিয়াছেন, ব্রিটিশ প্রশাসনের সহিত সহযোগিতা করিবার কথায় যে বয়ানে তিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন, সাভারকরও একই বয়ানে স্বাক্ষর করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও সাভারকরকে মুক্তি প্রদান করা হয় নাই। কেননা, ব্রিটিশ শাসক জানিত তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিলে পুনরায় যে বিপ্লবের অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে তাহা সামাল দিতে ব্রিটিশকে হিমসিম খাইতে হইবে।

ইহার পরও রাজনৈতিক সুবিধাভোগীরা অপব্যাখ্যাপূর্বক যেইভাবে নির্লজ্জ ইতিহাস বিকৃত করিয়া চলিয়াছে,তাহা খুবই দুর্ভাগ্যের।

সুভাষিতম্

অহোরাত্রাণি গচ্ছন্তি সর্বেষাং প্রাণিনামিহ।

আয়ূংষি ক্ষপয়ন্ত্যশু গ্রীষ্মে জলমিবাংশবঃ।। (রামায়ণ)

অর্থ ঃ দিন-রাত্রির প্রবহমানতার কারণে প্রাণীসমূহের আয়ু দ্রুত ক্ষয় হতে থাকে। যেমন গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপে জল দ্রুত শুকিয়ে যায়।

সিউডো-সেকুলারিজম আর জেহাদি মোল্লাবাদ রাজ্যের সাংস্কৃতিক জাগরণকে রুদ্ধ করে রেখেছিল

সাংস্কৃতায়ন

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই রাজ্যে 'পঞ্চ পরিবর্তন'-এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ঐতিহাসিক লিওনার্ড বা (লেনার্ড) এ. গর্ডন তার রচিত 'বেঙ্গল-দ্য ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট (১৮৭৬-১৯৪০)' গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন--- পাশ্চাত্যপন্থী কংগ্রেসের জন্মের বহু আগেই কীভাবে ভারতের স্বাধীনতার চেতনা ও জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল বঙ্গের সূতিকাগৃহে। বিগত সাত দশক কিংবা তারও বেশি সময় ধরে রাজ্যের তিন প্রধান শাসক বঙ্গের সাংস্কৃতায়ন বা সংস্কৃতীকরণকে অনেকটা জোর করেই আটকে রেখেছিল। কথা দু'টি প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সে ভাবনার লেশমাত্র যাতে তৈরি না হয় তার জন্য বিদেশি ভাবনা-সঞ্জাত শিক্ষক ও অধ্যাপককুলকে নামানো হয়েছিল। কলঙ্কিত বুদ্ধিজীবীর দল নিজেরাই সে কাজে ব্রতী হয়েছিল। বিদেশি ভাবনার মোড়কে তারা জাতীয়তাবাদের অপব্যাখ্যা করতেন। এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা সাংস্কৃতিক জাতীয়করণের চরম বিরোধিতা করত। 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধ'কে উগ্রতা বলে দাগিয়ে দিয়ে তার ভুল ব্যাখ্যা দিত।

সাংস্কৃতিক জাতীয়করণের দুই প্রধান চিন্তানায়ক আর প্রবক্তাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে এই প্রতিবেদকের এক শিক্ষকের কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। বহু ধরনের লড়াই চালানোর পর অবশেষে তিনি জয়ী হন। এই সাংস্কৃতায়ন বা সাংস্কৃতিক জাতীয়করণ কীভাবে প্রয়োগ হতে পারে তা বোঝাতে অন্যরা অক্ষম ছিলেন। কারণ বাকি অধ্যাপকরা তা কখনো পড়েননি বা জানেন না। তাদের কাছে সমাজতান্ত্রিক বা পাশ্চাত্যবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদ বোঝা অনেক সহজ। তাই এতদিন তারা ভারতের সাংস্কৃতিক জাতীয়করণকে বা জাতীয়তাবোধকে অগ্রাহ্য করেছেন। গত ৯ মে রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আশা করা যায় যে, জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতায়ন তার পূর্ণ রূপ পাবে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার মানুষকে বোঝাতে শুরু করেছে যে রাজ্যে আর দু'ধরনের আইন থাকবে না। বুলডোজার প্রয়োগে অতীতের সব অন্যায় আর দুর্নীতিকে মুছে দেওয়া হচ্ছে। মজহবের নামে অযাচিত ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য রাস্তায় বসে নমাজ বন্ধ করা হয়েছে।

সবে তো কলির সন্ধ্যা! ১৯৪৭ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত যে তিন ধরনের শাসক এ রাজ্য শাসন করেছে তারা সকলেই মুসলমানদের জন্য একরকমের আইন আর সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের জন্য অন্য আইন রেখেছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো আইনের শাসন প্রয়োগ হতো না। তাই খাগড়াগড়, মুর্শিদাবাদ, মোথাবাড়ি, ধুলাগড় বা সন্দেশখালিতে হিন্দুদের ওপর অন্যায় আক্রমণ নেমে আসত। ভোটব্যাংকের রাজনীতিতে মুসলমানদের একটা বড়ো অংশকে তেজপাতা আর দাবার বোড়ে বানিয়ে ওই তিন শাসক তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইন প্রয়োগ করত না। তাদের জন্য ছিল 'শাসকের আইন' আর সবধরনের 'আইন'-এর অপব্যবহারের দ্বারা হিন্দুদের জন্য কালা শাসন।

'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধ' যাতে বাঙ্গালির মনন আর চিন্তায় প্রবেশ না করে তার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় ক্ষতিসাধন করতে এক শ্রেণীর নিকৃষ্ট সাহিত্যিক, কবি আর উচ্ছিষ্টভোগীদের ব্যবহার করতো তিন শাসক। এই উচ্ছিষ্ঠভোগীরা তাদের সুবিধামত বাঙ্গালি মনীষীদের বহু লেখা ও বক্তৃতার অর্ধেক উক্তি প্রয়োগ করে সাংস্কৃতিক জাতীয়করণের ভাবনাকে আটকে রাখত। নবনির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসার পর সে মেঘ কাটবে বলেই মনে হয়। সমাজতাত্ত্বিক এমএন শ্রীনিবাস দেখিয়েছিলেন--- সংস্কৃতায়ন বা সাংস্কৃতায়ন কেন আর কীভাবে জরুরি। উত্তরপ্রদেশের জৌনসার বাওয়ারে জনজাতিদের দৈনন্দিন জীবনের উদাহরণ ব্যবহার করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'জনজাতীকরণ'। তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে জনজাতিদের সংস্কৃতায়ন। বিদেশি বামেরা, পাশ্চাত্যবাদী কংগ্রেস আর তৃণমূল গ্যাং এরাজ্যে যে কাদা ভর্তি পথ রেখে গিয়েছে তা সরিয়ে পিচ ঢালা রাস্তা তৈরির কাজ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেই করতে হবে। সাংস্কৃতায়নের পাশাপাশি বাঙ্গালির ভিতর থেকে হারিয়ে যাওয়া স্বদেশি স্বাভিমান ও স্বাজাত্যবোধও আবার নতুন করে জাগিয়ে তুলতে হবে। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তাই গতানুগতিক ভাবনার বাইরে থেকে বেরিয়ে এসে নবনির্বাচিত সরকারকে সামাজিক সমরসতা আর নাগরিকদের সবরকম পরিষেবা প্রদানের জন্য কর্তব্য পালন করতে হবে। প্রয়োজনে প্রতীকী পদক্ষেপ হিসেবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা প্রয়োজন যেমন উত্তরাখণ্ডে হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হতেই হবে— 'জাতীয় নাগরিক পঞ্জীকরণ'। তবেই এই পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হবে। রাজ্য সরকারের কাজের মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বকে বোঝাতে হবে তারা 'ব্যতিক্রমী' দল।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

অতিথি কলম

নরেন্দ্র মোদী (প্রধানমন্ত্রী)

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ভারত-ইতালি সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ

ইতালিতে 'রেনেসাঁ' প্রতিটি মানুষের মর্যাদার বার্তা দিয়েছে এবং মানুষ ও সমাজের সংযোগে সংস্কৃতির ভূমিকাকে তুলে ধরেছে। মানুষকে মূল কেন্দ্র রেখে ভারত-ইতালি অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করে তোলার অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এগোচ্ছে দুই দেশ।

ভারত ও ইতালির সম্পর্ক এখন নির্ণায়ক একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমাদের সম্পর্ক নিছক বন্ধুত্বের পরিসর অতিক্রম করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বে বিবর্তিত হয়েছে, যা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মূল্যবোধ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা যখন বিরাট মাত্রায় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে, সেই সময় ইতালি ও ভারতের অংশীদারিত্বের চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে নিয়মিত মতবিনিময়। তাতে নতুন মাত্রা সংযোজিত হচ্ছে অর্থনৈতিক গতিশীলতা, সামাজিক সৃজনশীলতা এবং হাজার বছরের সভ্যতাগত প্রজ্ঞা। আমাদের সহযোগিতা প্রতিফলিত করে এক অভিন্ন চেতনাকে, যার মূল কথা হলো একবিংশ শতকে সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার দিকগুলি নির্ধারিত হবে কোন দেশ কতটা উদ্ভাবনশীল, শক্তি ও জ্বালানি ক্ষেত্রে রূপান্তরে কতটা সক্ষম এবং কৌশলগত সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কতটা দক্ষ তার ওপর ভিত্তি করে। সেজন্যই আমরা আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও গভীর ও বহুমাত্রিক করে তুলতে সচেষ্ট, যাতে নিত্যনতুন লক্ষ্যে এগিয়ে চলা সম্ভব হয় এবং নিজেদের সক্ষমতাকে পরস্পরের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়।

আমরা উৎপাদন ক্ষেত্রে ইতালির দক্ষতা, বিশ্বমানের সুপার কম্পিউটার, যা শিল্প ক্ষেত্রে অমিত শক্তিধর একপক্ষ হিসেবে ইতালির অবস্থানকে তুলে ধরে, এমন বিভিন্ন ধরনের উৎকর্ষ এবং ভারতের দ্রুত আর্থিক বিকাশ, ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে দক্ষতা, ১০০-রও বেশি ইউনিকর্ন এবং ২ লক্ষ ২ হাজারেরও বেশি স্টার্টআপ-সমৃদ্ধ উদ্ভাবন এবং উদ্যোগ পরিমণ্ডলের মধ্যে একটি শক্তিশালী সমন্বয় মঞ্চ গড়ে তুলতে চাই। এটি নিছক সংযোগ হয়ে উঠবে না, যৌথ ভিত্তিতে তৈরি হওয়া এক মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্র তৈরি হবে, যেখানে দু'দেশের শিল্পগত দক্ষতা একে অপরের পরিপূরক।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ভারতের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেছে। ২০২৯ সাল নাগাদ ইতালি এবং ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ ২০ বিলিয়ন ইউরোতে নিয়ে যেতে চাই আমরা। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের পরিসরে থাকবে প্রতিরক্ষা, বিমান চলাচল, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, যন্ত্রাংশ, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা, রাসায়নিক, ওষুধপত্র, বস্ত্র, কৃষি-খাদ্য, পর্যটন এবং আরও অনেক কিছু।

সারা বিশ্বে 'মেড ইন ইতালি'র সঙ্গে উৎকর্ষের ধারণা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত এবং এর সঙ্গে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিতে উৎকর্ষের ক্ষেত্রে যে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, তার গভীর সংযোগ রয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে ভারতে উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করায় ইতালির শিল্প মহলে যে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে এবং ইতালিতে ভারতীয় শিল্প সংস্থাগুলির উপস্থিতি যেভাবে বাড়ছে, তা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। বর্তমানে উভয় দেশেই একে অপরের হাজারটিরও বেশি বাণিজ্যিক সংস্থা সক্রিয়। এটি অত্যন্ত ইতিবাচক একটি দিক এবং আমাদের সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী করে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক।

ভারতের অংশীদারিত্বের মূল কেন্দ্রে রয়েছে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন। আগামী দশকগুলির অভিমুখ নির্ধারিত হবে প্রযুক্তিগত বিপ্লবের মাধ্যমে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ক্রিটিক্যাল মিনারেলস এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোর মতো ক্ষেত্রগুলিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে। ভারতের গতিশীল উদ্ভাবনা পরিমণ্ডল, বিপুল সংখ্যক উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন পেশাদার এবং ইতালির শিল্পগত দক্ষতা ওইসব ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। দু'দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাকেন্দ্রগুলির মধ্যে

ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব তাতে আরও গতিসঞ্চার করবে। ভারতের ডিজিটাল জন- পরিকাঠামো, বিশেষত দক্ষিণ বিশ্বের দেশগুলিতে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সারা বিশ্বেরই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে এরই মধ্যে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। ভারত ও ইতালি বরাবরই বলে আসছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ হওয়া উচিত মানবকেন্দ্রিক। দু'দেশই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশের অনুঘটক হিসেবে দেখতে চায়।

এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দক্ষিণ বিশ্বের দেশগুলির বিশেষ স্থান রয়েছে। ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং সুলভ্য বহুভাষিক প্রযুক্তি সামাজিক বিভেদ দূর করতে পারে। প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানুষকে মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রাখায় ভারতের 'এমএএনএভি' বা 'মানব' দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইতালির 'এএলজিওয়ার-এথিক্স' সেকথাই বলে। ভারতে ডিজিটাল ক্ষেত্রের প্রসার এবং ইতালির শিল্পগত দক্ষতা এই লক্ষ্যেই কাজ করবে। আমরা এমন এক সমতাধর্মী ডিজিটাল ক্ষেত্র গড়ে তুলতে চাই, যেখানে প্রতিটি দেশ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুযোগ নিতে পারে। জি৭-এ ইতালির পৌরোহিত্য এবং নতুন দিল্লির এআই ইমপ্যাক্স সামিট ২০২৬ এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রতিফলিত করেছে। মূল কথা হলো, প্রযুক্তি মানুষের বিকল্প হতে পারে না এবং মানুষের মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘিত করতে পারে না। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং আলাপচারিতার পরিসরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। স্বাধীনতা এবং মানুষের মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে দুই দেশ ঐক্যবদ্ধ।

মহাকাশ ক্ষেত্রও আমাদের সহযোগিতার পরিসরে রয়েছে। মহাকাশ অভিযান এবং উপগ্রহ প্রযুক্তিতে ভারতের দক্ষতা এবং ইতালির এয়ারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এই সহযোগিতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

যেকোনো দেশের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সুস্থিতি আবশ্যিক বিষয়। প্রতিরক্ষা এবং কৌশলগত প্রযুক্তির পরিসরে ভারত ও ইতালি তাদের সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করবে। গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ-সহ বিভিন্ন হুমকি, আন্তর্জাতিক অপরাধচক্র, মানব ও মাদক পাচার, সাইবার অপরাধ প্রভৃতির মোকাবিলায় একযোগে কাজ করবে দুই দেশ।

জ্বালানি ক্ষেত্রটি আমাদের অংশীদারিত্বের আরও এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এই ক্ষেত্রের রূপান্তরের উদ্ভাবনা, বিনিয়োগ ও সহযোগিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশবান্ধব শক্তি থেকে হাইড্রোজেন প্রযুক্তি এবং স্মার্ট গ্রিড, সব ক্ষেত্রেই ভারত ও ইতালি সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করছে। গ্রিন হাইড্রোজেনের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠতে চায় ভারত। ইতালিও ইউরোপের 'এনার্জি গেটওয়ে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ। আন্তর্জাতিক সৌরজোট, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিরোধী পরিকাঠামো এবং বিশ্ব জৈব জ্বালানি জোটে দু'দেশের অংশীদারিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

"প্রযুক্তি মানুষের বিকল্প হতে পারে না এবং মানুষের মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘিত করতে পারে না। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং আলাপচারিতার পরিসরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। স্বাধীনতা এবং মানুষের মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে দুই দেশ ঐক্যবদ্ধ।"

বস্তুগত, ডিজিটাল ও মানবকেন্দ্রিক সংযোগ আমাদের একসূত্রে বেঁধেছে। ভারত ও ইতালি বিশ্ব অর্থনীতির দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে এখন আর বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে চলবে না। ভারত-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলটি বাণিজ্য, প্রযুক্তি, জ্বালানি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে ইউরোপের সংযোগের ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব অসীম। ফলে আমাদের বন্ধন প্রকৃতিগত দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ, যা দু'টি মহাদেশ এবং বিশ্বের নতুন চালচিত্রের পরিসরে বিশেষ ভূমিকা নিতে চলেছে।

এই প্রেক্ষিতে ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর (আইএমইসি)-এর মাধ্যমে আধুনিক পরিবহণ ও পরিকাঠামোগত সংযোগ গড়ে তোলার বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সংযোগের এই বিরাট উদ্যোগে একযোগে কাজ করছে ভারত ও ইতালি।

আমাদের সামনে আসা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সাংস্কৃতিক সংযোগ বড়ো ভূমিকা নিতে পারে। ভারতীয় ভাবধারায় 'ধর্ম' দায়িত্ববোধের কথা বলে। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' অর্থাৎ সারা বিশ্ব এক পরিবার— এই ধারণা আন্তঃসংযুক্ত ডিজিটাল যুগে আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এই মূল্যবোধের সঙ্গেও ইতালির মানবধর্মী ঐতিহ্যের মিল রয়েছে। ইতালিতে 'রেনেসাঁ' প্রতিটি মানুষের মর্যাদার বার্তা দিয়েছে এবং মানুষ ও সমাজের সংযোগে সংস্কৃতির ভূমিকাকে তুলে ধরেছে। মানুষকে মূল কেন্দ্র রেখে ভারত-ইতালি অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করে তোলার অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এগোচ্ছে দুই দেশ। ◻

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকটের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়েছে ভারত সরকার

গত ১০ মে তেলেঙ্গানার সেকেন্দ্রাবাদে একটি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজী দেশবাসীর উদ্দেশে ৭টি আবেদন জানান। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল— 'নেশন ফার্স্ট : ডিউটি অ্যাবাভ কমফোর্ট'। কয়েক মাস আগে আমেরিকা- ইজরায়েল বনাম ইরানের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইরান কর্তৃক অবরুদ্ধ হয় হরমুজ প্রণালী। ফলে বিশ্বজুড়ে সমুদ্রপথে জ্বালানি (খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস) সরবরাহ ব্যাপকভাবে ব্যাহত হতে থাকে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন দেশে ঘনিয়ে উঠতে থাকে জ্বালানি সংকট। আমদানি ব্যয়বহুল হয়ে ওঠায় জ্বালানির দাম বাড়তে থাকে। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতেও দফায় দফায় বেড়েছে জ্বালানির দাম। এমতাবস্থায় জ্বালানি সাশ্রয়, বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যয় রোধ এবং দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সাতটি উপায়ের বিষয়ে তাঁর ভাষণে অবতারণা করেছেন প্রধানমন্ত্রীজী— (১) যেখানে সম্ভবপর, সেখানে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' পদ্ধতি অবলম্বন, অর্থাৎ বাড়ি থেকে চাকুরি-সম্পর্কিত কাজকর্ম পরিচালনায় অগ্রাধিকার। (২) অন্তত এক বছরের জন্য সোনা ক্রয় থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা। (৩) পেট্রোল-ডিজেলের ব্যবহার কমানো; রেল, মেট্রো-সহ গণপরিবহণ ব্যবহার। (৪) ভোজ্য তেলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ। (৫) অজৈব রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিবর্তে জৈব কৃষির প্রতি গুরুত্ব আরোপ। (৬) বিদেশি ব্র্যান্ডের পণ্যের যথাসম্ভব কম ব্যবহার; বিদেশি পণ্য-নির্ভরতা কাটিয়ে স্বদেশি পণ্য ব্যবহার বৃদ্ধি। (৭) এক বছরের জন্য বিদেশ ভ্রমণ পরিহার।

প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে অনুরোধ করেছেন— কম পেট্রোল খরচ করতে, কম সোনা কিনতে। ইতিমধ্যেই দেশীয় বাজারে পরিশোধিত তেল (পেট্রোল- ডিজেল)-এর দাম বেড়েছে। ভারতীয় মুদ্রার (টাকার) দাম কমেছে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থনৈতিক সংকট ঘনিয়ে ওঠায় তৈরি হওয়া এই সমস্যার আর কী কী কারণ রয়েছে এবং এর থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কী সেই বিষয়ে আলোচনার জন্যই এই নিবন্ধের অবতারণা।

প্রথমে আলোচ্য বিষয় হলো— খনিজ তেলের দাম বাড়লে অর্থনীতিতে তার কী প্রভাব পড়ে? উত্তর হলো— খনিজ তেলের দাম বাড়লে কেন্দ্রীয় সরকারকে যে অতিরিক্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা খরচ করতে হয়, তাতে কমে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার। ফলে ভারতীয় মুদ্রার (টাকার) দামও কমে। বাড়ে 'ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস্ ডেফিসিট' বা লেন-দেনের ভারসাম্যের ঘাটতি। ফলে সরকার হয় খরচ (সরকারি ব্যয়) কমায়, নয়তো টাকা ছাপিয়ে সরকারি ব্যয় নির্বাহ করে বা টাকা ছাপিয়ে বাজারে ছাড়ে। সরকারি ব্যয় কমালে বহু মানুষ কাজ হারাবে, আর টাকা ছাপালে বাড়বে মুদ্রাস্ফীতি। ১৯৭৩-এ আরব- ইজরায়েল যুদ্ধের সময় ভারতে মুদ্রাস্ফীতি ২৯ শতাংশ এবং আর্থিক বৃদ্ধি ১ শতাংশ হয়েছিল। কারণ এই সময় সংকট এড়াতে তৎকালীন ভারত সরকার টাকা ছাপিয়েছে মনের আনন্দে এবং কমিয়েছে সরকারি খরচ। ড. অশোক মিত্র, ড. অর্জুন সেনগুপ্ত বা ড. মনমোহন সিংহ সেই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে ভারতীয় অর্থনীতিকে কেন বাঁচাতে পারেননি সেদিন? পরের বছর সিকিমকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে ইন্দিরা গান্ধীকে মানুষকে খুশি করতে হয় এবং জরুরি অবস্থা জারি করে অবস্থা সামাল দিতে হয় এর দু'বছর পর।

প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, মুম্বইয়ের ৩০ কোটি টাকা মূল্যের ফ্ল্যাটে বসবাসকারী মানুষের এবং বাঁকুড়ার একজন গোপালকের জীবন ও জীবিকার গুরুত্ব দেশের সরকারের চোখে সমান হওয়া উচিত। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া ব্যবসার নীতিতে সম্মতি দেননি তিনি। ফলে এখনও পর্যন্ত সম্পাদিত হয়নি ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি।

১৯৯০-৯১-এর আমেরিকা-ইরাক যুদ্ধের বিষয়ে আসা যাক। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ১৫ দিনে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতিতে পৌঁছে যায় ভারত। সেই সময় কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাওকে নেহরুভিয়ান মিশ্র অর্থনীতিকে ভারত মহাসাগরে বিসর্জন দিয়ে বাঁচাতে হয়েছে দেশ। মার্চ মাসের পর বিশ্ব জুড়ে খনিজ তেলের সরবরাহের সংকটের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো দেশে খুচরো জ্বালানির ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। এই দেশগুলিতে পেট্রোলের দাম বেড়েছে ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ। মায়ানমারে পেট্রোলের দাম বেড়েছে ৯০ শতাংশ। এর বিপ্রতীপে ভারতে পেট্রোপণ্যের সামগ্রিক মূল্যবৃদ্ধি

প্রায় ৭.৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য দেশের পথে হেঁটে এবার তো ওই পরিমাণ দাম বাড়াতে পারতেন মোদীজী। কিন্তু তাতে সরকারি প্রকল্পে বরাদ্দ কমবে, দাম বাড়বে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের এবং বহু মানুষ কাজ হারাবে। ব্যাপকভাবে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে অনুরোধ করেছেন কম খরচ করতে। কম সোনা কিনতে। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় কিন্তু সোনা কোনো সমস্যা ছিল না। কারণ দেশ ছিল গরিব। আজ দেশ গরিব নয়। তাই অতিরিক্ত সোনা কেনা থেকে বিরত থাকার জন্য দেশবাসীকে আবেদন করতে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীকে।

কোভিড মহামারীর সময়ও দেশবাসীর প্রতি নানা আবেদন করে দেশরক্ষা করেন মোদীজী। নোট বাতিলের সময়ও। এবারও তাই করছেন। সামাজিক একতা এবং দেশপ্রেমের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বের চাহিদা-জোগানের অসাম্যের পরিবর্তন করছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর আবেদনের পর ভারতীয় বাজারে কমেছে সোনার চাহিদা। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার মূল্যও হ্রাস পেয়েছে। এটা দেশের প্রতি দেশবাসীর ভালোবাসার প্রমাণ। প্রধানমন্ত্রীজীর আবেদনে সাড়া দিয়ে ভারত প্রমাণ করেছে তার শক্তি। 'বিশ্বগুরু' হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে এই নতুন ভারত।

এবার আসা যাক দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়ে। ভারতীয় মুদ্রার (টাকার) দাম কমার কারণ কী? খনিজ তেলের মূল্যবৃদ্ধি ছাড়াও, ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি না হওয়া হলো অন্যতম কারণ। ২০২৪-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে ভারতের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে আসছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এফআইআই (ফরেন ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টর)- দের প্রতি ট্রাম্প প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন ভারতীয় স্টক মার্কেট থেকে তাদের লগ্নি তুলে নিতে। ভারতীয় স্টক মার্কেটে ধস নামানো ছিল আমেরিকার উদ্দেশ্য। মার্কিন প্রেসিডেন্টের চাপের কারণে ভারতীয় স্টক মার্কেট থেকে ক্রমাগত লগ্নি তুলে নেওয়া চলছে। ফলে স্টক মার্কেট থেকে লগ্নি বেরিয়ে যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে 'ডলার' বেরিয়ে যাচ্ছে দেশ থেকে। কিন্তু এই বাণিজ্য চুক্তি কেন চূড়ান্ত হচ্ছে না? মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কথা শুনে ভারতীয় কৃষি ও দুগ্ধ ক্ষেত্রের বাজার খুলে দেননি ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এই বাজার খোলার সিদ্ধান্ত নিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বড়ো পুঁজির প্রবেশ ঘটবে ভারতে এবং এর পরিণামে প্রতিযোগিতার বাজারে পিছিয়ে পড়বে ভারতীয় কৃষক ও গোপালকরা। কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারের নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে মার্কিন পুঁজিপতিদের হাতে। মোদীজী যদি ভারতীয় কৃষক ও গোপালকদের স্বার্থ রক্ষা না করে মার্কিন কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যের জন্য ভারতীয় বাজার খুলে দেন, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগত সিদ্ধান্তে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আসতে পারে। ফলে আগামীদিনে আবার স্টক মার্কেটে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে, ভারতীয় মুদ্রা শক্তিশালী হবে, বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে এবং এই সব কিছুর সঙ্গে ঊর্ধ্বগামী হবে ভারতীয় স্টক মার্কেট। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর মনে হয়েছে যে, মুম্বইয়ের ৩০ কোটি টাকা মূল্যের ফ্ল্যাটে বসবাসকারী মানুষের এবং বাঁকুড়ার একজন গোপালকের জীবন ও জীবিকার গুরুত্ব দেশের সরকারের চোখে সমান হওয়া উচিত। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া ব্যবসার নীতিতে সম্মতি দেননি তিনি। ফলে এখনও পর্যন্ত সম্পাদিত হয়নি ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি।

গত ২৩ থেকে ২৬ মে ভারত সফরে এসেছিলেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো। তার সফরের প্রথম পর্যায়ে তাকে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে নিজের অনড় মনোভাব বুঝিয়ে দিয়েছে ভারত সরকার। ২৩ তারিখ বিমানে কলকাতায় পৌঁছান তিনি। কলকাতা বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন ভারতে অবস্থানকারী মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিব পর্যায়ের প্রোটোকল অফিসাররা। উল্লেখযোগ্য হলো, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোনো মন্ত্রী কিন্তু সফরের শুরুতে তাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত হননি। এরকম ব্যাপার আগে ভাবাই যেত না। কলকাতা থেকে নয়াদিল্লি পৌঁছানোর পর ২৩ তারিখ ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ২৪ তারিখ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন বিদেশ সচিবের সাক্ষাৎ ও বৈঠক হয় এবং ২৬ তারিখ 'কোয়াড'-এর বিদেশমন্ত্রীদের একটি সম্মেলনে যোগ দেন তিনি। সবার হয়তো মনে আছে যে, ২০১২ সালে মার্কিন বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিন্টন ভারতে এলে কীভাবে রেড কার্পেট পেতে কীভাবে রাজকীয় কায়দায় তাকে অভ্যর্থনা করা হয়। 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর মতো একটি অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজ্যের সচিবালয় মহাকরণে এসে সাক্ষাৎ করেন হিলারি ক্লিন্টন।

সব দুর্বলতা ও ক্লেশ ঝেড়ে ফেলে স্বতন্ত্র বিদেশনীতি প্রণয়নে সক্ষম হয়েছে নতুন ভারত। সোনা কম কেনা, পেট্রোল-ডিজেলের ব্যবহার কমানো, গণপরিবহণের ব্যবহার বৃদ্ধি, রান্নার গ্যাস ও ভোজ্য তেল বাঁচানোর আহ্বান কোনো রাজনৈতিক ফয়দা তোলার জন্য করা হয়নি। যে বিষয়গুলি দেশকে দুর্বল করে, সেই বিষয়গুলিকে কাটিয়ে উঠতে পারলে 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর স্বপ্ন আগামীদিনে সফল হবে। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান গভীর তাৎপর্য বহন করছে। দেশ সুরক্ষিত হলে দেশবাসী সুরক্ষিত থাকবে। আগামীদিনে আন্তর্জাতিক স্তরে অর্থনৈতিক সংকট আরও ঘনিয়ে উঠলে বা ভারতের ওপর বৈরী মনোভাবাপন্ন শক্তির পক্ষ থেকে কোনো আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি হলে ১৪০ কোটি ভারতীয়ের ইচ্ছাশক্তি ভারতকে সুরক্ষিত রাখবে। বাঁচলে সবাই বাঁচবে। এই গভীর সংকটের সময় একটু ত্যাগ, জীবনযাত্রার মানের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সবার করা প্রয়োজন। দেশের মানুষের একতাকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতি ও ভূ-অর্থনীতির যাবতীয় চ্যালেঞ্জ সামলাচ্ছে বর্তমান ভারত সরকার। □

স্বখাত সলিলে ডুবেছেন তৃণমূলনেত্রী ডুবিয়েছিলেন রাজ্যটিকেও

মৌ-লোভীদের চক্করে পড়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। স্তাবকদের খপ্পরে পড়ে তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন ইতিহাসের অমোঘ লিখন। বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন (ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়) পাঁচশোরও বেশি বছরের ইসলামি শাসনের অনিবার্য পতনের কথা কিংবা প্রায় দু'শো বছরের ব্রিটিশ শাসনও কীভাবে ভাঙা কোমর নিয়ে কোনওমতে কালাপানি পার হয়ে স্বদেশে ফিরে গিয়েছিল।

প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য

স্তাবকের সস্তা হাততালি কুড়োতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে ডোবালেন দলের সর্বময় কর্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। শুধু তা-ই নয়, তৃণমূল সুপ্রিমো নিজেও গাড্ডায় পড়েছেন প্রবল আত্মতুষ্টিতে ভুগে এবং দলের রশি ভাইপোর হাতে তুলে দিতে গিয়ে। ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে একদা তাঁরই সতীর্থ শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হাজার পনেরো ভোটে হেরে গিয়েছেন কালীঘাটের রাজনীতির কারবারি এই মহিলা। আজ্ঞে হ্যাঁ। ইচ্ছে করেই 'কারবারি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং অত্যন্ত সচেতনভাবেই। কারণ তার জমানায় দুর্নীতি হয়েছে সীমাহীন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা হয়েছে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে। বামেদের হটিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে সাপের পাঁচ পা দেখেছিলেন তিনি এবং তার দলের কেষ্টবিষ্টুরা। বামেদের কায়দায় তুষ্টীকরণের রাজনীতি করতে গিয়ে রাজ্যের অর্থনীতির ভিত তলানিতে নিয়ে গিয়ে ফেলেছেন সদ্য-প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। ক্ষমতায় বসার পর তৃণমূলনেত্রীর সততার প্রতীক মুখোশটা খুলে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে আসল মুখ। প্রশাসন কিংবা দলের অন্দরে নানা দুর্নীতির খবর ফলাও করে প্রকাশিত হলেও তিনি অন্ধ সেজে বসে ছিলেন। তার দলের নেতাদের এই 'করে খাওয়া'র রাজনীতিই কাল হয়েছে। দেশের শাসনভার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর হাতে যাওয়ার পরে তিনি সাফ জানিয়েছিলেন, 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা'। তবে তৃণমূলনেত্রী তো আর প্রধানমন্ত্রীর দল করেন না! তিনি মনেপ্রাণে এবং অবশ্যই ডিএনএতে কংগ্রেসি। কংগ্রেসকে ভেঙে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যেভাবে জন্ম দিয়েছিলেন ইন্দিরা কংগ্রেসের, প্রায় সেই একই কায়দায় পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেসকে গিলে নিয়ে তিনি গড়ে ফেললেন নয়া দল— তৃণমূল কংগ্রেস। 'কংগ্রেস' শব্দের প্রতি বঙ্গবাসীর একাংশের কিছুটা আবেগ জড়িয়ে ছিল। নতুন দল যাতে বঙ্গবাসীর সমর্থন পায়, তাই দলের নামের শেষে 'কংগ্রেস' লব্জটি সুন্দরভাবে ট্যাগ করে দেন ধুরন্ধর রাজনীতির কারবারি। যে কংগ্রেসের জল-হাওয়ায় বেড়ে উঠেছিলেন তিনি, যে কংগ্রেস তাকে জায়গা দিয়েছিল রাজনীতির ময়দানে, যে কংগ্রেস তাকে লোকসভায় জিতিয়ে নিয়ে গিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে 'হাতেখড়ি' দিয়েছিল, সেই 'হাত' শিবিরকে রাজ্য থেকে উৎখাত করতে ইসলামি শাসকদের কায়দায় ১৯৯৮ সালে কংগ্রেসের বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে ক্ষমতার আসনে বসে ছিলেন । নানা প্রলোভন দেখিয়ে, কংগ্রেসের বদনাম করে এক এক করে রাজ্যের প্রায় সব 'কংগ্রেসি'কেই নিজের দলে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসার খিদেটা চাগাড় দিয়ে উঠেছিল তার মনের মণিকোঠায়। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো এক সময় যা ছিল তার মনের গহীনে, তৃণমূলের 'মা' হয়েই জ্বলন্ত লাভা উগরে দেওয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকেন তিনি। যদিও বামেদের প্রবল প্রতাপের জেরে কাস্তে-হাতুড়ির জোটের বাড়া ভাতে ছাই দিতে পারেনি তৃণমূল। রাজনীতি করতে করতেই তিনি কৌশলে শিখে নেন বাম আমলে হওয়া ভোট লুটের কৌশল। পরে বামেদের হঠাতে সেই ব্রহ্মাস্ত্রই প্রয়োগ করেন তিনি। ভোট লুটের এই কৌশলের প্রয়োগ এবং বাম শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ২০১১ সালে লালপার্টির গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেন। যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে একদিন রাজনীতির ময়দানে এসেছিলেন কালীঘাটের একটি কলোনির বাসিন্দা, সেই তিনিই নজর কাড়েন তামাম ভারতের। ৩৪ বছরের বাম শাসনের যে অবসান ঘটানো যায়, বামেদেরও যে কোমর ভেঙে দেওয়া যায়, ভারতবাসীকে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ব্যস্, আর যায় কোথায়! ক্ষমতায় বসার পরেই পিঁপড়ের পালের মতো এক এক মৌ-লোভী ঘুরঘুর করতে থাকে তার চারপাশে। এই উচ্ছিষ্টভোজীদের দলে যেমন ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জ্যোতি বসুর আমলে 'করেকম্মে' খাওয়া বুদ্ধিজীবীরা, তেমনিই ছিলেন আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের রাজত্বে জন্মানো 'বুদ্ধজীবী' শ্রেণীর লোকজন। এগারোর বিধানসভা নির্বাচনে

ফঃ ২

বামদুর্গে ধস নামলে পরে সেই বুদ্ধজীবীর দল রাতারাতি গা থেকে লালজামা-মোজা খুলে ফেলে ভিড়ে যায় তৃণমূল দলে। বস্তুত, 'পরজীবী' শ্রেণীর এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা তৃণমূলনেত্রীকে কার্যত বসিয়ে দেন দেবী দুর্গার আসনে। এর পর শুরু হয় নেত্রী-স্তুতির প্রতিযোগিতা। কে, কাকে ঠেলে দিয়ে নেত্রীর ছোট্ট পানসিতে আগে উঠে পড়বেন, শুরু হয় তার লড়াই। এই সব স্তাবকের দল তৃণমূলনেত্রীকে গ্যাস খাইয়ে সুউচ্চ মিনারের মাথায় তুলে দেন। তার ফলেই রাজ্যকে নিজের পৈতৃক সম্পত্তি ভেবে নিয়ে যা খুশি তা-ই করে বেড়াতে থাকেন নেত্রী।

এসবই গা-সওয়া করে নিচ্ছিলেন তৃণমূলের নীচুতলার কর্মী-সমর্থকরা। যাঁরা ঘাম ঝরিয়ে, আত্মবলিদান দিয়ে বাম শাসনকে বিদায় জানিয়েছিলেন, তাঁরাই ক্রমশ ব্রাত্য হয়ে পড়তে থাকেন দলে। তাঁদের জায়গা দখল করতে থাকেন সিনে-ওয়ালিরা। যারা রং-চং মেখে টলিউড কাঁপান, দিনভর আলো করেন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালির ড্রয়িং রুমের টিভির পর্দা, যাদের সঙ্গে রাজনীতির সুতোর মতো যোগাযোগও ছিল না, তারাই অভিনয় ভুলে রাতারাতি আলো করতে শুরু করেন দলের মঞ্চ। নিছকই অভিনয়-শিল্পীরা নেত্রীর আশীর্বাদে হয়ে পড়েন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, ঢুকে পড়েন বুদ্ধিজীবীর তালিকাতে। তৃণমূলনেত্রী যখন স্তাবক-দল পরিবৃত হয়ে আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছেন গ্যাস খেয়ে, হাতে গড়া দলকে কৌশলে পারিবারিক করে ফেলেছেন, প্রবীণ ও পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদদের দূরে ঠেলে দলে ভাইপো-রাজ কায়েম করতে উঠেপড়ে লেগেছিলেন, বস্তুত তখনই টলে গিয়েছিল তৃণমূল নামক দল কিংবা কোম্পানিটার ভিত। দলের নীচুতলার এই ক্ষোভ টের পাননি নেত্রী। যখন বুঝতে পারলেন, তখন আর কিছু করার ছিল না। বল তখন তার নাগালের বাইরে। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের ফলেই তিনি তা জানতে পারলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের এই পনেরো বছরের রাজত্বে এক-এক করে খুলে পড়েছিল নিরন্তর সততার বাণী আওড়ানো তৃণমূলনেত্রীর মুখোশ। রাজ্যের একের পর এক দুর্নীতিতে জড়িয়েছে তার দলের হোমরাচোমরা নেতাদের নাম। কারও কারও ঠাঁই হয়েছে জেলের কুঠুরিতে, কেউ আবার ইডি-সিবিআইয়ের ভয়ে কাঁটা হয়ে রয়েছেন সর্বক্ষণ। তার পরেও বিশেষ হেলদোল দেখা যায়নি তৃণমূলনেত্রীর। তার বদ্ধমূল ধারণা ছিল, তিনিই 'বাংলা মা'। যেহেতু তারই নেতৃত্বে আন্দোলনের ফলে বামেদের ঢাকিশুদ্ধু বিসর্জন হয়ে গিয়েছে, তাই যা খুশি তা-ই করার অধিকার রয়েছে তার। তার এই ভাবনারই ফসল দলে ভাইপোর উত্থান। রাজনীতিতে নিতান্তই অনভিজ্ঞ ভাইপোকে নিজের উত্তরসূরি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আদতে দলের কবর খুঁড়েছিলেন দলনেত্রী স্বয়ং। নিন্দুকেরা অবশ্য বলেন, পিসির কাছ থেকে ভাইপো আর কিছু শিখুন বা নাই শিখুন, একটা জিনিস তিনি শিখেছেন, সেটা হলো কলতলার ভাষা! রাজনীতিতে এসে তিনি দেখলেন পিসির সস্তাদরের রাজনীতি কী সুন্দরভাবে খাচ্ছে বঙ্গবাসীর একাংশ! ছন্দ মিলুক না মিলুক, তার পিসি ঠিক ছন্দ মিলিয়েই ছাড়বেন (অনেকটা এঁড়ে গরু টেনে দো'-র মতো)! তিনি অনুসরণ করলেন পিসির পদাঙ্ক।

গণতন্ত্রের মহিমা শক্তিশালী বিরোধী দল। অলঙ্কার যেমন নারীর ভূষণ, বিজ্ঞাপন যেমন সংবাদপত্রের গয়না, বিরোধীরা ঠিক তেমন নন। বরং উল্টোটা। বিরোধী-হীন বিধানসভা কিংবা সংসদ একনায়কতন্ত্রের প্রতিচ্ছবি বলে মনে করা হয়। সরকারের ভুল-ত্রুটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াটাই বিশ্বের যে কোনো সুস্থ-গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধীদের কাজ। এতে লাভ হয় দু'ভাবে— একদিকে যেমন সরকার বিপথগামী হয় না, তাকে ঠিক রাস্তাটা দেখিয়ে দেওয়া হয়, তেমনি অন্যদিকে বিরোধীরাও উচ্চকণ্ঠে সচেতন করেন জনগণকে। যে কণ্ঠ না দমিয়ে সরকার পক্ষের উচিত, তাকে মান্যতা দেওয়া। তাতে আখেরে লাভ হয় শাসক দলেরই। কারণ দলীয় সুপ্রিমোর চারপাশে যে মৌ-লোভীরা সারাক্ষণ ভনভন করে ঘুরে বেড়ায় কিছু পাওয়ার আশায়, কিংবা অন্য কোনও ধান্ধায় কাজ হাসিল করতে যারা স্তাবকতা করেন, সেই চাটুকারদের কাছ থেকে প্রশাসনিক প্রধানকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। বিরোধীরা তাঁকে বুঝিয়ে দেন, হোয়্যাট ইজ হোয়্যাট!

এসব কিছুই বুঝতে পারেননি তৃণমূলনেত্রী। মৌ-লোভীদের চক্করে পড়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিলেন তিনি। স্তাবকদের খপ্পরে পড়ে তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন ইতিহাসের অমোঘ লিখন। তৃণমূলনেত্রী বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন (ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়) পাঁচশোরও বেশি বছরের ইসলামি শাসনের অনিবার্য পতনের কথা কিংবা প্রায় দু'শো বছরের ব্রিটিশ শাসনও কীভাবে ভাঙা কোমর নিয়ে কোনওমতে কালাপানি পার হয়ে স্বদেশে ফিরে গিয়েছিল, সেসব কথা।

ক্ষমতার মদে মদগর্বী তৃণমূলনেত্রী ভুলে গিয়েছিলেন যে, খান খান হয়ে একদিন ভেঙে পড়ে রাজছত্রও। মুকুট পড়ে থাকে সোনার সিংহাসনে, অত্যাচারী রাজা জনমত খুইয়ে মুখ লুকোয় মহাকালের গর্ভে। তারই মাশুল দিতে হয় 'বুদ্ধিজীবী'দের। যারা দলনেত্রীকে বন্ধকি সোনার মতো করে ভাঙিয়ে খাচ্ছিলেন, শিবের মাথার সাপ হয়ে কারণে-অকারণে ফোঁসফাঁস করছিলেন, তৃণমূলনেত্রী কুর্সি হারাতেই তারা হয়ে পড়েছেন নির্বিষ হেলে কিংবা লাউডগা সাপের মতো। কোনো এক কালে পশ্চিমবঙ্গে 'তৃণমূলেশ্বরীর মন্দির' হবে বলে যে কবি বা লেখক স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং বঙ্গবাসীকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, কিংবা উচ্ছিষ্টের কণামাত্র পেতে তৃণমূলনেত্রীর হাবিজাবি ছবি দেখে অথবা হম্বা হাম্বা ছড়া শুনে উচ্চকিত প্রশংসা করেছিলেন , নেত্রীর আসন টলে যেতেই, তারা ঢুকে পড়লেন স্বখাতে। একদিন যে খাত কেটে আঁজলা ভরে জল এনে ভরিয়েছিলেন দলনেত্রী নিজেই, সেই খাতেই সলিল সমাধি ঘটেছে পুরো দলের। যেখানে হাবুডুবু খেতে খেতে পদ্মের ডাঁটা ধরে কোনওক্রমে বাঁচার চেষ্টা করছেন কেউ কেউ। আর খেই হারিয়ে নেত্রী কেবলই আপন মনে বকে চলেছেন, ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও আমার রাজপাট...। কালীঘাটের মন্দিরের দেওয়ালে দলনেত্রীর সেই ক্রন্দনরোলই এখন প্রতিধ্বনিত হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ।

মন্দিরের গর্ভগৃহে তখন ফিকফিক করে হাসছেন জগন্মাতা স্বয়ং! যেন বলছেন, অহঙ্কারীর পতন রুখতে পারে না স্বয়ং নিয়তিও...। অতএব... ◻

মন বদলালো পশ্চিমবঙ্গ

বঙ্গ-রাজনীতিতে ফিরে আসুক সুস্থ পরিবেশ

কনক চৌধুরী

সাধারণ মানুষের জন্য শুরুতে পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তৃণমূলের মধ্যেকার একটি বিশেষ রাজনৈতিক লড়াই বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ভারতের আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা অজিত দোভালের রিপোর্ট সম্পর্কে না জানলে কিছুতেই বোঝা যাবে না। ৩৪ বছরের দীর্ঘ বাম জমানার পর ১৫ বছর ধরে মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের মূলস্রোত থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। প্রায় ১১ কোটি লোকের এই রাজ্যে বিবিধ শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, সাহিত্য, খেলাধুলা সবকিছুতেই যেভাবে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল তার ছিটেফোঁটাও দেখেনি রাজ্যবাসী। দিনে দিনে পশ্চিমবঙ্গ তার নিজস্বতা হারিয়েছে। একদিকে হিন্দুদের মনে জেহাদি আক্রমণের ভয় ঢোকানো, অন্যদিকে বাঙ্গালিকে 'হিন্দুত্ব' ও বহুত্বের চেতনার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার খেলা চলেছে দীর্ঘদিন ধরেই। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের এর ব্যাপকতা বুঝে উঠতে কিছুটা সময় লেগে গিয়েছে। মমতা ব্যানার্জি নিজেও জানতেন যে, মুসলমান ভোটব্যাংককে কেন্দ্র করে রাজনীতি সহজ ও সংক্রামক। বিশাল সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে বাংলাদেশের জামাতের ষড়যন্ত্র,আওয়ামি লিগ আর বিএনপি-র টানাপোড়েনের রাজনৈতিক অস্থিরতা পশ্চিমবঙ্গকে মারাত্মকভাবে ভারাক্রান্ত করছিল বিগত ১৫ বছর বা তারও আগে থেকেই। তৃণমূল কংগ্রেস সহজ ও সস্তা রাজনীতির পথে হেঁটে দিনে দিনে পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব সত্তাকে দুর্বল করেছে। শিল্পাঞ্চলে তালা পড়েছে, বেকারত্ব বেড়েছে, লক্ষ মানুষ কাজের খোঁজে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চলে গিয়েছেন। স্থানীয় লোকদের হাতে থেকে ব্যবসা চলে গেছে মুসলমানদের হাতে। নিজেদের নিজস্বতা থেকে কমিউনিস্টদের ঘুণ ধরা, বস্তাপচা গল্প এবং রিগিং আর সন্ত্রাসের রাজনীতিতে হাত পাকিয়ে ফেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রে শুধু পশ্চিমবঙ্গকে নয় পুরো ভারতকেই নিরাপত্তার প্রশ্নে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছিল। নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে তৃণমূল হাসি মুখে হিন্দু জনগণকে নির্লজ্জের মতো কোণঠাসা করে গেছে প্রতিদিন। একদিকে মুসলমান-স্বার্থ, জামাতের চক্রান্ত, রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনকে কেন্দ্র করে হিংস্র মোল্লাবাদ নির্দ্বিধায় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে শুধু পশ্চিমবঙ্গকেই নয়— এর রেশ আছড়ে পড়েছে মেঘালয়, বিহার, অসম ও ত্রিপুরায়। ভারতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলি অবস্থানের বিষয়ে বিরাট প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। তোলাবাজি, কাটমানি, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, চাকরিক্ষেত্রে স্বজন পোষণ, দুর্নীতি ও মহিলা নির্যাতন একটা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল পশ্চিমবঙ্গে গত ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে। মানুষ তাই আর চায়নি তৃণমূলনেত্রীকে। এই ল্যান্ডস্লাইড বিজয় সহজেই সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছে হিন্দু ভোট এবং মুসলমান ভোটের মেরুকরণ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগে থেকেই। কয়েকটা বছর ধরে বাঙ্গালির ঘুম হয়ে উঠেছিল কুম্ভকর্ণের ঘুম। বলতে দ্বিধা নেই যে, পশ্চিমবঙ্গকে রাহুমুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শা সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন এবারের ভোটের ময়দানে। শুভেন্দু অধিকারীকে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। এবারের ভোট যেন ছিল এক কঠিন বাজি। শুভেন্দুবাবু দারুণভাবে সেই বাজি জিতে নিলেন। তৃণমূলের শুধু বিসর্জনই নয়, ভবানীপুর আসনে তৃণমূলনেত্রীর পরাজয়কেও নিশ্চিত করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পথে-ঘাটে-মাঠে জনজাগরণে দেখা গিয়েছে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের। আগাগোড়া পরিবর্তনের সময়টাতে ত্রিপুরার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দেখা গেছে ওতপ্রোতভাবে পশ্চিমবঙ্গের আনাচে-কানাচে। গত দু'বছর ধরে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার বিতাড়ন, মোল্লাবাদের চরম উত্থান এবং বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর তীব্র নির্যাতন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ হিন্দু জনগণ, সুশীল সমাজ তথা কলকাতার বাঙ্গালি ভদ্রলোকদের এককাট্টা হতে বাধ্য করেছে। শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ি-সহ অন্যান্য তৃণমূলি জনপ্রতিনিধিদের বাড়িতে বিপুল পরিমাণ দুর্নীতির ছাপ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাইপো অভিষেক এবং তার গুন্ডাবাহিনীর নির্লজ্জ অহমিকার প্রকাশকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ছুঁড়ে ফেলে দিতে আর দ্বিধা করলেন না।

কোনো সন্দেহ নেই, অনেক প্রত্যাশা-সহ নতুন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সামনে প্রচুর চ্যালেঞ্জ থাকবে। সব বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি ঘটবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে সঙ্গে নিয়ে এটাই সময়ের প্রত্যাশা।

৩৪ বছরের বামপন্থীদের অন্ধকার শাসনকে সরিয়ে দিয়ে নিজের পনেরো বছরের শাসনে মমতা ব্যানার্জি সেই একই পথে হাঁটলেন। বলতে দ্বিধা নেই তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসনে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের মেরুদণ্ড তৃণমূলের কাছে জমা করে দিয়েছিলেন। নেত্রীকে খুশি করতে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই তোষামোদকারী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বঙ্গভূমিতে সিন্ডিকেট আর তোলাবাজির নগ্ন রূপ,ব্যাপক দুর্নীতি ভাবতে পারা যায় না? যে সমাজের কবি, শিল্পী,সাহিত্যিক চটি-চাটা হয়ে যায় সেই সমাজের ভবিষ্যৎ সত্যিই ভয়াবহ হয়ে পড়ে। একদিকে যেকোনো ধরনের দুর্নীতি, অপরদিকে ভোটব্যাংকের জন্য নির্লজ্জভাবে জেহাদি তোষণ পশ্চিমবঙ্গকে সার্বিকভাবে কোণঠাসা করে তুলে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভোটের দামামা বাজার শুরু থেকে ৪ মে, ২০২৬-এর ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত শুভেন্দু অধিকারী-সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব প্রথমবার সরাসরি পশ্চিমবঙ্গে উচ্চারণ করেন হিন্দু ও মুসলমান ভোট সম্পর্কে! অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যে দৃপ্ত পদক্ষেপে অসমে বিজেপির বিজয়ের হ্যাটট্রিক নিশ্চিত করেছেন ঠিক সেই পথেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুবাবু হাঁটা শুরু করেছেন বলে মনে হচ্ছে। এটা নিশ্চিত, তৃণমূলের রাজনৈতিক পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এই বিসর্জন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারেনি তারা। নিশ্চিতভাবেই তৃণমূল, কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিজেপিতে অনুপ্রবেশ শুরু হবে পশ্চিমবঙ্গ ও অসম জুড়ে। এটা স্বাভাবিক। এগুলো রাজনীতির সিলেবাসের অংশমাত্র। পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড়ো পাওনা হবে অসম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, চিকিৎসা পরিষেবা, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান। সর্বোপরি, আঞ্চলিক ও জাতীয় নিরাপত্তায় হিন্দুদের ৪ মে, ২০২৬-কেন্দ্রিক জনজাগরণ ভারতের আধুনিক ইতিহাসে একটি বড়ো অধ্যায় রচনা করতে চলেছে। গত ৪ মে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে সাংবাদিক, আলোচক তথা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মুখে একটা কথা বারবার উঠে এসেছে যা এত খোলাখুলি আর বোধহয় কখনো হয়নি। সেটা হল হিন্দু ভোট ও মুসলমান ভোট। যেকোনো রাজ্যের সব অংশের মানুষের বা সুশীল সমাজের চাহিদা থাকে যাতে তাদের সন্তানেরা সুশিক্ষিত হয়, ভালো থাকে, শান্তিতে থাকে। ধর্ম পালন, ধর্ম সংস্থাপন এক জিনিস আর মজহবকে ব্যবহার করে মোল্লাবাদ সম্পূর্ণভাবে আলাদা জিনিস। বাংলাদেশের দীপু দাসকে পুড়িয়ে মারার ঘটনা কি কোনো দিন ভুলে যাওয়া সম্ভব? একটা বড়ো অংশের সাধারণ, শ্রমজীবী, মানুষদের সুনির্দিষ্টভাবে নিজেদের অন্ধকার স্বার্থে মজহবের নামে একত্রিত করা ও পরিচালিত করার শক্তির পরিচয় অসম বা পশ্চিমবঙ্গে সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, আরজি কর হাসপাতালে অভয়া হত্যাকাণ্ডের পর তৃণমূলের একজন মহিলা জনপ্রতিনিধিকেও এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। এবারের ভোটে মহিলারাও নীরব প্রতিবাদ জানিয়েছেন কঠোরভাবে। জনতা জনার্দন জানান দিয়েছেন যে, তারা জাগরিত হচ্ছেন এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে পিছুপা হবেন না। কোন পরিস্থিতিতে পৌঁছালে একটি দেশের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল শুধুমাত্র একতরফা মজহবি তোষণের জন্য নিজেদের মিছিল-মিটিঙে উচ্চারণ করে বিদেশের স্লোগান— 'জয় বাংলা!' ১৯৭১-এর রক্তাক্ত স্মৃতি কি এতটা সহজেই ভুলে যাওয়া সম্ভব? বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের বিভ্রান্ত করার এটা কি নির্লজ্জ প্রয়াস নয়?

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন, সুপ্রিম কোর্ট ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও সুপ্রিম কোর্টকে অবাধ, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য ধন্যবাদ দিতেই হবে। নজিরবিহীন নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিকাঠামোর ব্যবস্থা এবার পশ্চিমবঙ্গে করেছিল নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফার মৃত্যুহীন নির্বাচন ও ব্যাপক ভোটদান দেখে অনেক বয়স্ক মানুষও অবাক হয়ে গেছেন। সাধারণত ভোটের আগেপিছে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে উঠত মৃত্যুপুরী! এবার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অবাধ ভোটদানকে নিশ্চিত করেছিল নির্বাচন কমিশন। মানুষ ৯০ শতাংশের ওপরে ভোট প্রদান করেছিলেন শুধুমাত্র এসআইআর- এর জন্য নয়, তারা তাদের ভোটাধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তারা অস্তিত্বের লড়াইয়ের শরিক হতেই মাঠে নেমেছিলেন, ভারতের অন্যতম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দিতে মনেপ্রাণে এগিয়ে এসেছিলেন সবাই। ভবানীপুর থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পরাজয় এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। ওপিনিয়ন পোলের যে রিপোর্ট বেরিয়েছিল তাকে পর্যন্ত ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ। যোগাযোগ, চাষবাস, ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য উপযুক্ত এই রাজ্য কীভাবে কমিউনিস্ট পার্টি ও তৃণমূলের লাল-নীল থাবায় পড়ে এতটা রাহুগ্রস্ত হয়ে গেল--- সেটাই হয়তো ভোটগ্রহণের আগের রাতে ভেবেছেন এরাজ্যের বেশিরভাগ ভোটার। শুধুমাত্র বাঙ্গালির আবেগকে ভুল পথে কাজে লাগিয়ে এবং ভোটব্যাংক বাড়ানোর জন্য অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি মুসলমানদের এরাজ্যে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে রাজনৈতিক চক্রান্তের মাধ্যমে মুসলমান জনসংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া তো আজকের প্রক্রিয়া নয়।

বিগত ১৫ বছরের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বড়ো শিক্ষা নিতে পারে মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরার মতো রাজ্যগুলি। ২০২৬-এর ৪ মে-র পুরো দিন টিভির পর্দায় চোখ রেখে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের নিশ্চয়ই মনে পড়েছে ২০১৮-তে পঁচিশ বছরের কমিউনিস্ট সরকারকে 'চলো পালটাই'-এ পরাজিত করার অনুভূতির কথা। আরও জোরালোভাবে সেই একই অনুভূতি পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে নেমে এসেছিল বলেই সবার ধারণা। কোনো সন্দেহ নেই, অনেক প্রত্যাশা-সহ নতুন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সামনে প্রচুর চ্যালেঞ্জ থাকবে। সব বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি ঘটবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে সঙ্গে নিয়ে এটাই সময়ের প্রত্যাশা। □

অখণ্ড ভারতের অস্তিত্ব এবং পাকিস্তান বিরোধিতা প্রসঙ্গে বীর সাভারকর

সৈকত নিয়োগী

জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যখন 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিলেন ইউসুফ মেহের আলি, খুব সঙ্গতভাবেই সমাজতন্ত্রীদের সেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গান্ধী-আবহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। যদিও একদিকে সাতারা, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে স্বাধীন সরকার গঠন করে সশস্ত্র সংগ্রামের পথেই স্বাধীনতার অঙ্গীকার দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসের সদস্যপদ না নেওয়া গান্ধীর নেতৃত্ব দেশের ওপর অহিংসা নীতি চাপিয়ে দেয়। সময় কিছুটা গড়ালে সমান্তরালে চলতে থাকে পাকিস্তান প্রস্তাবের আলোচনা। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন যে গান্ধীবাদীদের হাতে শেষপর্যন্ত 'ভারত ভাঙো' আন্দোলনে পরিণত হতে চলেছে, এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন অখণ্ড ভারত রক্ষার অন্যতম সংগ্রামী নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকর। ১৯৪৪ সালের ১৬ জুলাই এই মর্মে হিন্দু মহাসভার সভাপতি সাভারকর আগস্ট মাসে 'অখণ্ড হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তান বিরোধী সপ্তাহ' পালনের নির্দেশ দিলেন। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের বেশ কয়েকজন ক্ষমতালিপ্সু নেতার সঙ্গে মুসলিম লিগ তখন ভারত ভাগের সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রচনা করছে। সাভারকর বললেন, 'All Hindu Sanghatanists should take up the pledge to oppose the Provincial self determination principle aiming at the vivisection of our Motherland and defend the national integrity and units of Hindustan from the Indus to the Seas.'

এই মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষায় সিন্ধু থেকে মহাসমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভূমিতে যে সকল অধিবাসীগণ নিজেদের এই দেশের জল-মাটি-বাতাসের সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছেন, তারা সকলেই হিন্দু। ভারতীয় জাতিসত্তা হলো—'হিন্দু'; যে হিন্দু জাতি বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ধারক। পুনের 'মারাঠা' পত্রিকায় সাভারকরের এ বক্তব্য প্রকাশিত হতেই চারিদিকে শোরগোল পড়ে যায়। ২১ জুলাই ১৯৪৪। জয়পুরের মহারাজা সেই প্রদেশের সিভিল সার্ভিসে উর্দু ভাষা বাধ্যতামূলক করলে প্রতিবাদ পত্র পাঠালেন সাভারকর। তিনি বললেন, যে প্রদেশের ৯৩ শতাংশ হিন্দু সেখানে বাধ্যতামূলকভাবে উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার মতো ভয়ংকর তোষণ নীতি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বীজ বপন করবে। বঙ্গপ্রদেশে হিন্দু মহাসভার কর্মীদের তিনি সাধুবাদ জানালেন--- চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর প্রাদেশিক বিভেদ নীতির প্রতিবাদে সর্বত্র জনসভা আয়োজনের জন্য।

১ আগস্ট। দেশব্যাপী চলতে থাকা রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনা এবং মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে পুনাতে জনসভায় উপস্থিত হলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অভিনন্দন জানিয়ে সাভারকর জানালেন— 'হিন্দু মহাসভার সভাপতির আসনে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাই। সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের যা পরিস্থিতি তাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় এই পদ একপ্রকার কাঁটার মুকুট যা দেশের পক্ষ হতে আপনাকে ধারণ করতে হবে।'

৭ ও ৮ অক্টোবর ১৯৪৪। দিল্লিতে 'অখণ্ড হিন্দুস্তান লিডার্স কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন ধার্য হয়। গান্ধী-জিন্না বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে তখন ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করার রূপরেখা রচিত হয়ে চলেছে। জিন্নার উসকানিতে মুসলমান সম্প্রদায় দেশের বিভিন্ন প্রদেশে সভা, সমাবেশ আয়োজন করে ঘোষণা করছে, আসন্ন নবরূপায়ণে 'ভারত' দেশটির সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ভারত থেকে যতগুলি সম্ভব প্রদেশ ছিন্ন করে তারা নতুন দেশ গড়ে তুলতে চায়। সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজীর উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে সাভারকর বললেন, ''গান্ধীজী কংগ্রেসের কাছে দেশের চারটি প্রান্তিক প্রদেশ 'পাকিস্তান' নির্মাণের জন্য দান করতে কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থন চেয়েছেন। অখণ্ড ভারতের সামগ্রিক অস্তিত্ব এতে বিপন্ন হবে। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে গঠিত কংগ্রেস আজ এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যেখানে ভারতের জাতীয় ঐক্য বিপন্ন। এমন কূটনৈতিক অভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে সংগ্রাম না করলে ভারতবর্ষের নাম পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যাবে!'' ওয়ার্ধা থেকে গান্ধীজী পাকিস্তানি ট্রেন চালানোর প্রস্তাব দিলে রুখে দাঁড়ালেন সাভারকর। স্বাস্থ্য ভগ্নপ্রায়, হিন্দু মহাসভার সভাপতিত্বের পদ থেকে সরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও যুগসংকল্পের কথা মনে করিয়ে দিলেন।

ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই দেশজুড়ে পাকিস্তান-বিরোধী সভা ও সমাবেশ শুরু হয়ে যায়। ১০ ডিসেম্বর এমনই এক সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন বীর সাভারকর। সিন্ধ প্রদেশের মুসলমান সম্প্রদায় প্রাদেশিক সরকার গঠন করে সেখানে 'সত্যার্থ প্রকাশ' গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সাভারকর ঘোষণা করলেন বোম্বাই শহরে হিন্দু সাংগঠকরা মন্ত্রিত্ব দখল করতে পারলে সেখানে কোরান বাজেয়াপ্ত হবে। কারণ সেই গ্রন্থে অমুসলমানদের 'কাফের' সম্বোধন করা হয়েছে। সেন্ট্রাল প্রভিন্সের মাণ্ডালা জেলা প্রশাসন— মুসলমান ছাত্রদের নমাজ পড়ার জন্য শুক্রবার সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখা নির্দেশ জারি করেছিল। প্রতিবাদে সাভারকর বলেন, ব্রাহ্মণদের উপাসনার জন্য প্রত্যেক দিন দুপুর বারোটার সময় সারা দেশের সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখার জন্য আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে। —মুসলিম

লিগের এমন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতি কংগ্রেস উদাসীন থেকে পরিস্থিতি জটিল করে তুলছে। সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর আক্রমণের পাল্টা আক্রমণ না করলে ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সম্ভব হবে না। তৎকালীন বোম্বাই পৌরসভায় হিন্দু মহাসভা পরাজিত হয়। কংগ্রেসের পাটিল সাহেব ও নাগিনদাস মাস্টার জয়ী হয়েই গান্ধীজীর প্রতি বদান্যতা ও অনুরাগ দেখাতে 'পাকিস্তান প্রস্তাব'-এর প্রতি সমর্থন জানায়। বলাবাহুল্য, কপটতার মাধ্যমে জেতা এই পৌরপিতা-দ্বয়ের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা রাস্তায় নেমে 'পাকিস্তান প্রস্তাব'-এর প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করে। এর প্রভাব পড়ল যুক্তপ্রদেশে। সেখানকার পৌর নির্বাচনগুলিতে অধিকাংশ জায়গাতেই হিন্দু সাংগঠকরা জয় লাভ করে। ইটাওয়াতে সমস্ত আসনে হিন্দু মহাসভার সাংগঠকরা জয় লাভ করে। সাভারকর ঘোষণা করলেন, দেশ জুড়ে ভবিষ্যতেও যখনই নির্বাচন হবে হিন্দুরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে হিন্দু স্বার্থ রক্ষায় ভোট দেয়, তাহলেই ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকবে।

'পাকিস্তান'-এর প্রশ্নে, 'পাকিস্তান' দাবির পক্ষে যে প্রধান এবং কার্যত একমাত্র নীতি ছিল, তা হলো ভারতবর্ষের সীমানা সংলগ্ন কয়েকটি প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সেই কারণেই মুসলমানরা দাবি করেছিল যে, যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ রয়েছে, সেগুলিকে পৃথক করা হোক। এভাবেই তারা সিন্ধু প্রদেশকে পৃথক করতে চেয়েছিল এবং গান্ধীবাদী গোষ্ঠীর ছদ্ম-জাতীয়তাবাদী ভুল নীতির ফলে, কিছু তথাকথিত হিন্দুর সম্মতিক্রমেই সিন্ধু পৃথক হয়েছিল। হিন্দু মহাসভা এ বিষয়ে বারবার সতর্ক করেছিল, প্রতিবাদ জানিয়েছিল এবং সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল যে, এই নীতি অবশ্যম্ভাবীভাবে দেশকে বিভাজনের দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু কংগ্রেসপন্থী হিন্দুরা এক অলীক 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্য'-এর নেশায়, এই ছদ্ম-জাতীয়তার মোহে এতটাই মত্ত ছিল যে, তারা মনে করত মুসলমানদের যত বেশি ছাড় দেওয়া হবে, স্বরাজ ততই নিকটে আসবে। তারা হিন্দু মহাসভার সদস্যদের এই সতর্কবার্তাকে উপহাস করেছিল, তাদের 'সাম্প্রদায়িক' বলে আখ্যা দিয়েছিল এবং যেসব মুসলমান এই বিপজ্জনক ছাড়গুলি চাইছিল, তাদেরই 'ভ্রাতৃসম জাতীয়তাবাদী' বলে অভিহিত করেছিল! মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে পৃথক করার পর পরিকল্পনা অনুযায়ী পরবর্তী অবশ্যম্ভাবী পদক্ষেপ ছিল 'পাকিস্তান'-এর দাবি। মুসলমানদের যুক্তি ছিল যে, যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেসব প্রদেশের জনগণ যদি গণভোটের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে তাদের ভারতের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন দেশ গঠনের অধিকার থাকা উচিত। তাদের দৃষ্টিতে 'পাকিস্তান প্রস্তাব'-এর মূল ভিত্তিই ছিল এই যুক্তি। এই যুক্তি এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল যাতে অসতর্ক গণতন্ত্রী ও ছদ্ম-জাতীয়তাবাদী হিন্দুরা আত্মঘাতী সমর্থনে সম্মোহিত হয়ে পড়ে। কিন্তু মুসলমানরা যে গণতান্ত্রিক মুখোশে পাকিস্তান আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উপায় বলে মনে করেছিল— যার উদ্দেশ্য ছিল উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের পাঁচ-ছয়টি প্রদেশকে এক আঘাতে মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করা; তা খুব শীঘ্রই দাক্ষিণাত্যে 'নিজামিস্তান' গঠনের পথে এক বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, নিজামের দাবি— যা কেবল সাম্প্রতিক কালের সৃষ্টি নয়, বরং ১৯৪০-এর আগে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে কখনও অস্পষ্টভাবে, কখনও স্পষ্টভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে উত্থাপিত হয়ে এসেছে, মূলত এই ছিল যে— নাগপুর, বেরার, অন্ধ্র থেকে শুরু করে পূর্ব সমুদ্র উপকূল ও মাদ্রাজ পর্যন্ত, এমনকী কানাড়ার কিছু অংশও নিজামের হাতে সমর্পিত হবে এবং নিজামের শাসনের অধীনে (অবশ্যই সম্ভাব্য এক ভবিষ্যৎ নবাব হিসেবে) একটি সুসংহত মুসলমান রাজ্য গঠনের অনুমতি দিতে হবে।

কিন্তু পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থনকারী গণতান্ত্রিক ও মজহবি যুক্তিই যেকোনো সময় এই স্বপ্নকে ধ্বংস করতে পারে। কারণ বেরার থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত এই সমস্ত প্রদেশে হিন্দুরাই ছিল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। যদি 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার'-এর নীতি গ্রহণ করা হয় এবং পাকিস্তানপন্থীদের নির্ধারিত নীতিমতো এই সব অঞ্চলে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়, তবে হিন্দুদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা বর্তমান নিজাম শাসনের অস্তিত্বই মুছে দিতে পারে। এই কারণেই নিজাম ব্যালট বাক্সকে এত ভয় পেতেন। ফলে নিজামের দরবারের কূটনীতিকরা বাধ্য হয়েছিল উপাসনা পদ্ধতির ভিত্তিতে দেশ বা জাতি গঠনের নীতির বিরোধিতা করতে এবং মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নির্ভরশীল গণভোটের ধারণাকেও নিন্দা করতে। এই কারণেই নিজামের প্রতিনিধি পাকিস্তান প্রস্তাব এবং মজহবি সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশ গঠনের নীতিকে স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করেছিলেন।

এর পাশাপাশি তাদের আরেকটি উদ্দেশ্যও ছিল— সেই দুর্বলচিত্ত হিন্দুদের আকৃষ্ট করা, যারা সবসময় এমন কোনও মুসলমানের সন্ধানে থাকত যিনি জাতীয়তাবাদীদের মতো কথা বলেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠত, 'এ তো একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান!' এবং তাকে একপ্রকার পূজ্য প্রতীকে পরিণত করে নিজেদের বিচারবুদ্ধি, আত্মসম্মান ও হিন্দু স্বার্থকে তার সামনে বলি দিত, শুধুমাত্র এই কারণে যে তিনি জাতীয়তাবাদীদের ভাষায় কথা বলেছিলেন।

হিন্দু সমাজের এই বৃহৎ অংশ সহজেই বিশ্বাস করে যে— নিজামের এই প্রচারকরা যখন পাকিস্তানের বিরোধিতা করছে এবং উপাসনা পদ্ধতি-ভিত্তিক বিভেদের সমালোচনা করছে, তখন তারা নাকি আন্তরিক বিশ্বাস থেকেই তা করছে; এবং এমন 'জাতীয়তাবাদী' ও 'ন্যায়সঙ্গত' নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত 'নিজামিস্তান' হিন্দুদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে না। বরং যদি হিন্দুরা এমন একটি দেশের আধিপত্য মেনে নিয়ে মুসলমানদের সন্তুষ্ট করতে পারে, তাহলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে— হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ব্রিটিশদেরও বলা যাবে, 'চলে যাও'।

এই কারণেই বহু হিন্দুকে সন্তুষ্ট করা এবং নিজামের রাজ্যে অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতাকে ভোঁতা করার উদ্দেশ্যে নিজামের গোপন ও প্রকাশ্য প্রতিনিধিরা 'পাকিস্তান'-এর সমালোচনা করত এবং নিজামিস্তানকে কেবল নিজামবংশীয় শাসন ও চুক্তিগত অধিকারের ভিত্তিতে সমর্থন করত। ফলে খুব সম্ভব ছিল যে, ভেড়ার চামড়া পরা নেকড়ের মতো অনেক ব্যক্তি দাক্ষিণাত্যে ঘুরে বেড়াবে এবং হিন্দুদের নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে বলবে যে 'নিজামিস্তান' ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তারা পাকিস্তানি দাবিকে ঘৃণা করে। অন্যদিকে পাকিস্তানপন্থীরাও নিজেদের নীতির পক্ষে নিজামপন্থীদের নিন্দা করতে পারে। তাদের এই সংঘর্ষ বাইরে থেকে সম্পূর্ণ বাস্তব বলেই মনে হবে।

দেশভাগের প্রেক্ষাপট হৃদয়বিদারক ভাবে রচিত হয়। প্রবল রক্তপাত, হিন্দুদের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম, বিশ্বাসঘাতকতা সবকিছু মিলিয়ে অখণ্ড ভারতের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়— ক্ষতবিক্ষত দ্বিজাতিতত্ত্ব, যার ফলে আজও ভারতের নানা দুর্ভোগ অব্যাহত রয়েছে। সেদিন স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে ওঠা অশনি সংকেতের প্রতি— প্রত্যেক ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন, দিয়েছিলেন নিরসনের রূপরেখা। মহান বিপ্লবী বীর সাভারকরের আদর্শ অনুসৃত হলে অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্ন একদিন সফল হবে। তাঁর প্রবর্তিত আদর্শের সেই পথ অনুসরণ করলে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ব্যবস্থার নাগপাশ ছিন্ন হয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে ভারতবর্ষ আবার 'এক জাতি, এক প্রাণ' হয়ে উঠবে। □

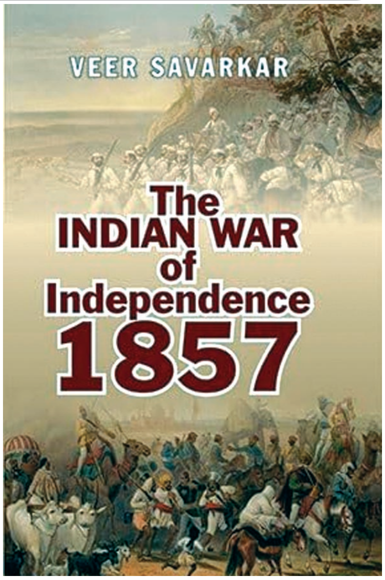

প্রকাশের আগেই নিষিদ্ধ যে বই

গৌতম কুমার মণ্ডল

প্রকাশের আগেই কোনো বই কি নিষিদ্ধ হয়েছে ? উত্তর হলো— হ্যাঁ হয়েছে। আর বইটি হলো বিখ্যাত বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকরের লেখা বই 'The Indian War of Independence 1857'। স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর আজকের ভারতে যতই বিতর্কিত চরিত্র হোন না কেন, তিনি যে একজন প্রখর দেশভক্ত বিপ্লবী ছিলেন সে কথা অস্বীকার করা অন্যায়। তিনি যখন আইন পড়তে লন্ডনে গিয়েছিলেন সেই ১৯০৭ সালে তখন মহাসংগ্রামের ৫০ বছর পূর্তির সময়কাল। এই মহাসংগ্রামের বিষয়ে ইতিমধ্যেই বিদেশি ইতিহাসবিদরা বেশ কয়েকটি বই লিখে ফেলেছেন। সাভারকর সে সব বই পাঠ করেছিলেন, কিন্তু এই মহান বিপ্লবের যথার্থ ইতিহাস খুঁজে পাননি। তাই নিজেই বহু অধ্যবসায় ও তথ্য সংগ্রহ করে লিখলেন মহাসংগ্রামের প্রথম ইতিহাস যা ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। বইটি লিখলেন নিজের মাতৃভাষা মারাঠিতে। লেখা শেষ হলো ১৯০৮ সালে। সাভারকরের বয়স তখন মাত্র ২৪ বছর। পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ সাভারকর লন্ডনের 'ফ্রি ইন্ডিয়া সোসাইটি'র সাপ্তাহিক সভায় আলোচনা করেছিলেন। গোয়েন্দারা এখান থেকেই টের পেয়ে যান পাণ্ডুলিপিতে কী আগুন রয়েছে! ব্যস্, বইটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

তারপর এই বই প্রকাশ করার জন্য লন্ডনের দেশভক্ত তরুণ ভারতীয় ছাত্রেরা বহু গোপন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সে এক মজাদার ইতিহাস যা বহু রোমাঞ্চে ভরা। বইটি সম্পর্কে সাভারকরের আলোচনার পরই দেখা যায় পাণ্ডুলিপির দু'একটি অধ্যায় আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরে জানা যায় গোয়েন্দাদের কোনো চর এই অংশ চুরি করে পৌঁছে দিয়েছে স্কটলান্ড ইয়ার্ডের সদর দপ্তরে। তা সত্ত্বেও মূল পাণ্ডুলিপি সাভারকরের উদ্যোগে আবার ঠিকঠাক করে গোপন পথে পৌঁছে যায় বোম্বাই বন্দরে। কিন্তু কোনো প্রকাশক এটি প্রকাশ করার সাহস দেখাননি। শেষপর্যন্ত এই পাণ্ডুলিপি আবার অত্যন্ত গোপনীয়তায় প্যারিস পৌঁছয়, সেখান থেকে লন্ডনে লেখকের হাতে।

> বইটির মূল মারাঠি পাণ্ডুলিপিটি একেবারেই নিখোঁজ হয়ে যায়। সাভারকরের গ্রেপ্তারের পর প্যারিসে মাদাম কামার হাতে আসে মূল পাণ্ডুলিপিটি। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের হাতে যাতে পাণ্ডুলিপিটি না চলে যায় তার জন্য মাদাম কামা এটি ব্যাংক অফ ফ্রান্সে জমা রেখে দেন, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির ফ্রান্স আক্রমণের পর ফ্রান্সের অবস্থা যখন টলমল, তারপর থেকেই সেই পাণ্ডুলিপির আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। একটি নিষিদ্ধ বইয়ের মূল পাণ্ডুলিপি এভাবে চিরতরে হারিয়ে গেল।

লন্ডনে তখন বহু তরুণ ভারতীয় ছাত্রের বাস। তাঁরা নিজেদের মতো করে দু'একটি সংগঠন তৈরি করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন। এরকমই একটি সংগঠন ছিল 'অভিনব ভারত' সিক্রেট সোসাইটি। বিদেশে থেকেও মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের জন্য এঁরা কাজ করেছেন। 'অভিনব ভারত'-এর এক তামিল বিপ্লবী ছাত্র ভিভিএস আইয়ার (১৮৮১-১৯২৫)-এর তত্ত্বাবধানে মারাঠি ভাষা জানা কোনো ছাত্র বইটির ইংরেজি অনুবাদ সম্পূর্ণ করলেন। কিন্তু ইংল্যান্ডে বইটির প্রকাশ সম্ভব নয়। প্রথমে ছাত্ররা জার্মানি থেকে বইটি প্রকাশ করার তোড়জোড়

করলেন এবং এজন্য বহু অর্থ ব্যয় করলেন। কিন্তু সফল হলেন না। বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হলো না ফ্রান্স থেকেও। শেষপর্যন্ত হল্যান্ড থেকে ১৯০৯ সালে বহু গোপনীয়তার সঙ্গে প্রকাশিত হলো 'The Indian War of In-

> **১৯৪৬ সালে প্রায় ৪০ বছর পর বোম্বাই প্রদেশের কংগ্রেস সরকারের উদ্যোগে বইটির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। বহুদিন পর ভারতে বইটি মুক্তির আলো দেখতে পায়।**

dependence 1857'। বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫১।

হল্যান্ডে প্রকাশের পর চোরাপথে বইটির ১০০টি কপি বোম্বাই বন্দরে এসে পৌঁছায়। বন্দরে লালমুখো কাস্টমস্ কর্তাদের চোখে ধুলো দিতে নানান মজাদার উপায় অবলম্বন করতে হয়েছিল। এসব কাজে ভারতীয় ছাত্ররা রীতিমতো পাকা ছিলেন। পরে আবার হাজার কপি বই এভাবেই চলে আসে। পৌঁছে যায় ভারতের নানা প্রান্তে বিপ্লবীদের হাতে। বইয়ের এই প্রথম সংস্করণ 'অভিনব ভারত'-এর বিপ্লবী ছাত্ররা দেশের নানা প্রান্তে বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দিলেন বিনামূল্যে। তারপর এই বই প্রকাশিত হয়েছে ফ্রান্স থেকে এবং সে দেশ-সহ আয়ারল্যান্ড, রাশিয়া, জার্মানি, আমেরিকা, মিশর প্রভৃতি বহু দেশের পাঠকদের হাতে পৌঁছে গেছে ব্রিটিশের নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়া এই বইটি।

১৯০৭-০৮ সালে যথার্থ গবেষকের নিষ্ঠা নিয়ে সাভারকর এই বইটি রচনা করেন। এই সময় বেশ কয়েকমাস তিনি লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে বসে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি যে ইতিহাস লিখলেন তা শুধুই তথ্যভারে ভারাক্রান্ত হলো না। বইয়ে যেমন বিপ্লবীর আবেগ প্রকাশ পেল, তেমনি পেল মহাসংগ্রামে অংশগ্রহণকারী মহান সৈনিক ও আত্মবলিদানকারীদের প্রতি ঋণশোধের তাগিদ। সাভারকর এই ইতিহাস না লিখলে আজ হয়তো হারিয়ে যেতেন তাঁতিয়া টোপি, মঙ্গল পাণ্ডে, কুনওয়ার সিংহ, আহমাদুল্লাহ শাহ, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈদের বীরগাথা। কিংবা হয়তো এঁরা কিছু অবাধ্য সৈনিকের এক সামান্য বিক্ষোভের নায়ক-নায়িকা হিসেবেই বিবেচিত হতেন। সাভারকরই মহাসংগ্রামকে 'ভারতের প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রাম' আখ্যা দিলেন। আর আগামীদিনের তরুণদের মনে দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করার স্বপ্ন সঞ্চার করলেন। তাই গোপনে প্রকাশের পর থেকেই এই বইটি দেশের বিপ্লবীদের কাছে ছিল এক অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। বইটির একটি কপি সংগ্রহ করতে পারলে তাঁরা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করতেন। একে তো নিষিদ্ধ বইয়ের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে বেশি। তার উপরে ছাত্র-যুবদের মনে দেশভক্তির উন্মাদনা নিয়ে আসত এই বই। তাই গোপনে পাওয়া গেলেও এই বইটির দাম তখন হু হু করে বাড়তে থাকে। এমনকী ১৯১১ সালেই এই বইয়ের একটি কপির দাম কোথাও কোথাও হয়ে যায় ৩০০ টাকা!

এই তুমুল চাহিদার মধ্যেই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯১০ সালেই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় মূলত মাদাম কামা ও লালা হরদয়ালের উদ্যোগে। বইটির হিন্দি, পাঞ্জাবি, উর্দু অনুবাদও প্রকাশিত হয় এবং ভারতে চলে আসে। ভারতের বাইরে ইংরেজি বইটির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ভারতে বিপ্লবী ভগৎ সিংহ বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর বিপ্লবী দলের সদস্যদের মধ্যে বইটি বিক্রি করে তা দলের তহবিলে জমা করতেন। ভগৎ সিংহ এবং তাঁর সহযোগীরা ধরা পড়লে তাঁদের প্রায় সবার কাছ থেকেই পুলিশ এই বই বাজেয়াপ্ত করে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বইটির পঞ্চম সংস্করণ তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনাদের জন্য নিত্যপাঠ্য হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন। বিদেশে বইটি নানা জায়গা থেকে আরও বেশ কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে। তবে কোথায় কখন প্রকাশিত হয়েছে তার সব হিসেব নেই। যেমন বইটির তামিল অনুবাদ ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু কে কোথা থেকে এই অনুবাদ প্রকাশ করেন তা জানা যায় না। তবে ১৯৪৬ সালে প্রায় ৪০ বছর পর বোম্বাই প্রদেশের কংগ্রেস সরকারের উদ্যোগে বইটির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। বহুদিন পর ভারতে বইটি মুক্তির আলো দেখতে পায় ।

তবে এত সবের মধ্যে বইটির মূল মারাঠি পাণ্ডুলিপিটি একেবারেই নিখোঁজ হয়ে যায়। সাভারকরের গ্রেপ্তারের পর প্যারিসে মাদাম কামার হাতে আসে মূল পাণ্ডুলিপিটি। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের হাতে যাতে পাণ্ডুলিপিটি না চলে যায় তার জন্য মাদাম কামা এটি ব্যাংক অফ ফ্রান্সে জমা রেখে দেন, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির ফ্রান্স আক্রমণের পর ফ্রান্সের অবস্থা যখন টলমল, তারপর থেকেই সেই পাণ্ডুলিপির আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। একটি নিষিদ্ধ বইয়ের মূল পাণ্ডুলিপি এভাবে চিরতরে হারিয়ে গেল।

(লেখক পুরুলিয়ার সুইসা-স্থিত নেতাজী সুভাষ আশ্রম মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক)

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

লেখকেরা গিরগিটি হলে ইতিহাস বিকৃত হয়

একথা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না যে, প্রকৃত সাহিত্য সমাজের দর্পণ। আজকের যথার্থ সাহিত্য-কর্ম আগামী দিনের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। প্রাচীন বঙ্গ তথা প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের তেমন কোনো বিবরণ লিপিবদ্ধ প্রমাণ নেই। ঐতিহাসিক প্রমাণ খুঁজতে গিয়ে আমাদের নির্ভর করতে হয়, শিলালিপি, তাম্রলিপি, গুহালিপি, লোককথা, মুদ্রা, বিভিন্ন পুঁথি, পাণ্ডুলিপি ও বিদেশি পরিব্রাজকদের লেখা বিবরণের উপর। যুগান্তরের সাহিত্যই হচ্ছে তৎকালীন সময়ের ইতিহাসের মূল উপাদান।

কলহনের রাজতরঙ্গিণী প্রাচীন কাশ্মীরের ঐতিহাসিক দলিল। শুধু কাশ্মীর নয়, প্রাচীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিবরণ এই কাব্যগ্রন্থ থেকে পরবর্তী ঐতিহাসিকরা গ্রহণ করেছেন। রাজতরঙ্গিণী দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হলেও মহাকবি কলহন বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি, তাম্রলিপি, শিলালিপি অনুসন্ধান করে তাঁর গ্রন্থে প্রথম প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করেছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ 'রামচরিতম্' পাল যুগের এক প্রামাণ্য দলিল বা আকরগ্রন্থ। শ্লেষ রীতিতে রচিত এই কাব্যে রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনির সঙ্গে রাজা রাম পালের কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন ও বরেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধারের কাহিনি সমান্তরাল ভাবে বর্ণিত হয়েছে। চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী)। শুধু বাংলা নয়, অসমীয়া, ওড়িশা, মৈথিলী ভাষার আদিরূপও এই চর্যাপদ। এই পদ বা দোঁহাগুলিতেই তৎকালীন সময়ের ডোম, শবর, তাঁতি, জেলেদের জীবনযাত্রা, পেশা, পোশাক পরিচ্ছদ এবং তাদের জীবনের কঠোর দারিদ্র্যের প্রতিচ্ছবি বর্ণিত হয়েছে।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যযুগীয় বঙ্গের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের অমূল্য সম্পদ হলো মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের কাহিনি ও চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের আড়ালে এই কাব্যে সাধারণ মানুষের নিত্য দিনের সংগ্রাম, লৌকিক বিশ্বাস, সমাজ ব্যবস্থা, পেশা এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বৃহত্তর ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের এক অপূর্ব চিত্র ফুটে উঠেছে।

সে তো গেল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বঙ্গের কথা। ব্রিটিশ বঙ্গে যে সব সাহিত্য রচিত হয়েছে, সেখানেও চিত্রিত সমাজের মূল ছবি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি কঙ্কণ মুকুন্দ দাস, কল্লোল যুগের লেখক বা আরও যারা তৎকালীন সময়ের কবি, কথাশিল্পী, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ছিলেন, তাঁদের লেখাগুলো নিছকই গল্প কবিতা প্রবন্ধ উপন্যাস নাটকই ছিল না।

ব্রিটিশ বঙ্গ তথা ভারতকে জানতে হলে সেই সময়ের প্রখ্যাত লেখকদের লেখাকেই অবলম্বন করতে হবে। এই মনীষীদের লেখাগুলি কালের নিখুঁত 'দর্পণ'। তাঁদের লেখায় আমরা 'কাল'-কে খুঁজে পাই। সেই সময়ের মনস্তত্ত্ব, কুপ্রথা, কুরীতি, দারিদ্র্য, পেশা, বিপ্লব, বিদ্রোহ, দ্রোহ, অনাচার, অনৃতাচার, অত্যাচার, দুর্নীতি, স্বার্থপরতা, শোষণ প্রভৃতির নিখুঁত ছবি তাদের লেখা ছাড়া আমরা আর কোথায় খুঁজতে যাব?

স্বাধীনোত্তর কালেও বলিষ্ঠ লেখক ছিল। তাঁদের বলিষ্ঠ লেখনীও ছিল। ক্ষুরধার লেখাও ছিল। তখনও পর্যন্ত লেখকদের স্বাধীন সত্ত্বা ছিল, রাষ্ট্রবোধের ভাবনা ছিল। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে, সামাজিক অবক্ষয় নিয়ে লেখা, বেকারের যন্ত্রণা নিয়ে লেখাগুলি সমাজের প্রতিচ্ছবি। তখনও সমাজের মর্মান্তিক মর্মকথা কবিতায়, গানে, গল্পে, উপন্যাসে বিভিন্ন প্রবন্ধে মর্মরিত হয়েছে। বিগত রাজ্য সরকারের আমলে সাহিত্য এসে ঠেকেছে মঞ্চে। কী মারাত্মক অবক্ষয়! আর এই অবক্ষয়ের সুযোগে ক্ষীর-ননী-মাখন-ছানা খাওয়ার লোভে জুটে গেল বাম জমানার তথাকথিত সুশীল সমাজের একটা অংশ, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী— লেখক-শিল্পী-কবি- অভিনেতা, আর জুটলো নবাগত পদলেহনকারী, যারা এই সময়ের সাধক-লেখক-শিল্পী পরিচয়ে মঞ্চ দাপাতে শুরু করলেন। এদের হাতে যেমন ছিল পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি জগৎকে শাসন করার ক্ষমতা, তেমনি তাদের কাঁধে ছিল তৃণমূল সরকারকে যেকোনো ভাবে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে নবীন প্রবীণ এই তথাকথিত লেখকদের দেখা গেল বিভিন্ন মঞ্চে সরকারের (তৃণমূলের) প্রার্থীর হয়ে প্রচার করতে। এই চিত্র শুধু রাজধানী কলকাতার নয়, প্রতিটি জেলায় এই স্তাবক লেখকেরা নিজ নিজ এলাকার প্রার্থীর হয়ে বিভিন্ন চ্যানেলে, মঞ্চে, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিগত সরকারের পক্ষে গলা ফাটিয়েছেন, মিথ্যা উন্নয়নের পাঁচালি পড়েছেন। এখন তারাই সবুজ জামা ছেড়ে গৈরিক বসন পরে সাধু সাজার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এদেরই কেউ কেউ আবার তাত্ত্বিকভাবে পত্রপত্রিকায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন তারা শুধু সরকারের ইতিবাচক দিকটা তুলে ধরেছিলেন, এটা দোষের কিছু নয়।

প্রশ্ন হলো, তাদের চোখে শুধু ইতিবাচক পড়লো, নেতিবাচক কিছুই পড়লো না। বিগত সরকারের সবটাই তো ছিল নেতিবাচক। সীমাহীন দুর্নীতি—নিয়োগ দুর্নীতি, আরজি কর কাণ্ড, বালি চুরি, কাটমানি, গোরুপাচার, নারী নিগ্রহ, শিল্পপতিদের বিনিয়োগ-অনীহা। এসব নিয়ে তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত একজন কবি, লেখক একটি কবিতা, গান, গল্প বা উপন্যাস লিখেননি! তাহলে 'সাহিত্য সমাজের দর্পণ' এই প্রবচনটি কি মিথ্যা?

বিগত সরকারের একটি ইতিবাচক দিক হলো জেলায় জেলায় পরিকাঠামোহীন ইউনিভার্সিটি ও মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা। এই ইতিবাচকের মধ্যে যদি নেতিবাচকের বিষপোকা শুরু থেকেই ঢুকে থাকে তাহলে কি তাকে ইতিবাচক বলা চলে?

দেখা গেল, ধীরে ধীরে এই শিক্ষাঙ্গনগুলো রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে, এহেন দুষ্কর্ম নেই যে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ঘটেনি। নিয়োগ দুর্নীতি, মাফিয়াগিরি এমনও শোনা যায় কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজের উত্তরবঙ্গ লবির সঙ্গে আরজি করের অভ্যাকাণ্ডের যোগ আছে। এই হলো বিগত সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টান্ত। এই পনেরো বছরে কোনো শিল্পপতি পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করার কথা চিন্তা করার সাহস পর্যন্ত পায়নি।

আজকাল দেখা যাচ্ছে যে সব লেখক-লেখিকা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, মিডিয়ায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূলের প্রার্থীর হয়ে প্রচার করলেন, আজ তারা পালটি খাচ্ছেন। তাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা আপনাদের অবস্থানে অনড় থাকুন, কে আপনাদের রং পালটাতে বলেছে? কেউ কি দিব্যি দিয়েছে? আপনারা তো নিজে নিজেই বদলে যাচ্ছেন, এটা প্রকৃত লেখকদের শোভা পায় না। প্রতিটি লেখকের একটা মতাদর্শ থাকে, বিচারধারা থাকে, না থাকলে তিনি লেখকই নন। গত দেড় দশক দেখা গেছে, মঞ্চ আলো করে বসে থাকা লেখকরা শুধু রাজ অনুগ্রহ পাননি, এই রাজসুখ টিকিয়ে রাখার জন্য মিথ্যা ভাষণ করেছেন, ইতিহাস বিকৃত করেছে। তাদের কোনো দর্শন নেই, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নেই, পদলেহন ছাড়া

ফঃ ৩

উৎকৃষ্ট কোনো লেখা নেই। এইসব তথাকথিত কবি, লেখকদের এখুনি বর্জন না করলে আগামীতে আবার অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই দেড় দশক নামি দামি লেখকরা যদি পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত ছবি তুলে ধরতেন তাহলে এরাজ্যের এই দুর্দশা হতো না। নবনির্বাচিত বর্তমান রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, পদলেহী লেখকরা ভাঁড় হতে পারেন, কোনো কালেই লেখক পদবাচ্য হতে পারেন না। তারা তাদের মতো লিখতে থাকুন, মাথায় তোলা উচিত হবে না।

পশ্চিমবঙ্গের যথার্থ সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে হলে স্তাবকদের বর্জন অনিবার্য। নিবন্ধের শেষে এই চার পঙ্‌ক্তির উল্লেখ খুবই প্রাসঙ্গিক—

‘কবিদের রং নয়, মেরুদণ্ড থাকতে হয়
কবিদের লোভ নয়, সর্বত্যাগী হতে হয়।
কবিদের মঞ্চ নয়, লেখার ঘর তার স্বর্গ
প্রত্যেক কবির কলম, ধর্মযুদ্ধের খড়্গ।’

অশোক কুমার ঠাকুর, কোচবিহার।

একটি আত্মঘাতী বিলের খসড়া ‘কমিউনাল অ্যান্ড টার্গেটেড্ ভায়োলেন্স বিল-২০১১’

কমিউনাল অ্যান্ড টার্গেটেড্ ভায়োলেন্স’ নামে একটি বিলের খসড়া ২০১১ সালে তৈরি করা হয়েছিল। ইউপিএ সরকারের আমলে একটি সংস্থা— ‘জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ’ (এনএসি) এই আইনের খসড়া তৈরি করে। সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বাধীন এই সংস্থার সদস্য ছিলেন— তিস্তা সীতলওয়াড়, হর্ষ মন্দার, খ্রিস্টান নেতা জন দয়াল, ফারহা নকভি, নিয়াজ ফারুকি-সহ অন্যান্যরা।

বিলটিতে মোট ন’টি অধ্যায় এবং ১৩৮টি ধারা ছিল। কিন্তু এই বিলটি কেন আনা হয়েছিল এবং এর উদ্দেশ্যই-বা কী— এ বিষয়ে কোনো শব্দ ছিল না। বিলের প্রথম অধ্যায়ে ‘গ্রুপ’-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে। বলা হয়েছে— ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু শ্রেণী এবং অন্তর্ভুক্ত হবে। মূলত মুসলমান ও খ্রিস্টান সমাজের মানুষই ‘গ্রুপ’ এবং বাকিরা ‘অন্য’ হিসেবে গণ্য হবে। ‘সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা’, ‘বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার’ ইত্যাদির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই বিল অনুযায়ী দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি ‘গ্রুপ’-এর সদস্যদের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়, তাহলে কেবল তাকেই ‘সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা’, ‘বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার’ ইত্যাদির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই বিল অনুযায়ী দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি ‘গ্রুপ’-এর সদস্যদের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়, তাহলে কেবল তাকেই ‘সাম্প্রদায়িক ও উদ্দেশ্যপূর্ণ দাঙ্গা’ বলে মানা হবে। কিন্তু যদি অন্যদের অর্থাৎ হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তির হানি ঘটে তবে তাকে ‘সাম্প্রদায়িক ও উদ্দেশ্যপূর্ণ হিংসা’ বলে ধরা হবে না।

‘গ্রুপ’-এর কোনো ব্যক্তির ব্যবসাবাণিজ্যে বাধা দিলে অথবা সামাজিক অপমান করলে বা মনে ব্যথা দিলে ‘শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশ তৈরির অপরাধ’ বলে গণ্য করা হবে। পক্ষান্তরে, কোনো হিন্দু অপমানিত হলে, এমনকী নিহত হলেও তাকে ‘পীড়িত’ বলে বিবেচনা করা হবে না। কেননা, বিলের খসড়া অনুযায়ী ‘গ্রুপ’-এর অন্তর্ভুক্ত লোকই পীড়িত বলে গণ্য হবে। বিলের ৩নং ধারা অনুযায়ী কোনো হিন্দু মহিলা যদি ‘গ্রুপ’-এর কোনো সদস্যের দ্বারা ধর্ষিতা হন, তবে তাকে ধর্ষণ বলে মানা হবে না। অথচ উলটোটা হলে, অর্থাৎ ‘গ্রুপ’-এর কোনো মহিলা যদি ‘গ্রুপ’-এর সদস্য নয় এমন কারও দ্বারা ধর্ষিতা হন তবে তাকে ধর্ষণ বলে মানা হবে এবং কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হবে।

যদি দুই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা হয়, তবে সেক্ষেত্রেও সংখ্যাগুরু সমাজের যে কোনো ব্যক্তিকে হিংসা ছড়ানোর দায়ে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই প্রমাণ করতে হবে যে সে নির্দোষ। এই বিলে আবার বিনা বিচারে দীর্ঘদিন আটক রাখারও সংস্থান আছে। ‘গ্রুপ’-এর অন্তর্গত কোনো গোষ্ঠী ‘গ্রুপ’-এর অন্য কোনো গোষ্ঠীকে আক্রমণ করলে বা নির্যাতন অথবা অপমান করলে অথবা সম্পত্তি দখল করলেও তা সাম্প্রদায়িক হিংসা বলে গণ্য হবে না। অর্থাৎ এক বা একাধিক মুসলমান যদি খ্রিস্টান বা অনুসূচিত জাতি বা জনজাতির কোনো মানুষের ওপর চড়াও হয়, তাদের মহিলাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে বা তাদের ধর্মস্থান অপবিত্র করে তাহলেও এই আইন কার্যকরী হবে না। তাৎপর্য এই যে, বরাক উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে মুসলমান পুরুষ-মহিলাদের দুষ্কৃতীরা যেভাবে সময়ে সময়ে দুষ্কৃতীরা জনজাতি সমাজের পুরুষ মহিলাদের ওপর হামলা চালায়, সেই হামলাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হবে। হিন্দু ও বৌদ্ধরা এর প্রতিরোধ করতে গেলে এই বিল অনুসারে তাদের বিরুদ্ধেই সরকার ব্যবস্থা নেবে।

এখানে কয়েকটি প্রাবধান মাত্র উল্লেখ করা হলো। এই বিলে আরও এমন সব বিধি-বিধান আছে যা কেবল মধ্যযুগীয় শাসনতন্ত্রেই থাকতে পারে। কোনো আধুনিক সভ্য দেশে এরূপ বিধি-বিধানের প্রস্তাবনা অকল্পনীয়। তবে সৌভাগ্যের বিষয় হলো, সারাদেশের প্রবল প্রতিবাদের মুখে বিলটি তখন সংসেদে উত্থাপিত হয়নি এবং পরবর্তীতে ২০১৪ সালে সরকার পরিবর্তিত হওয়ায় বিলটি হিমঘরে স্থান পায়।

প্রস্তাবিত কমিউনাল ভায়োলেন্স বিলে যেসব আইনি সংস্থান সুপারিশ করা হয়েছিল তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল— ‘ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মূলত এবং একমাত্র দায়ী হিন্দু সমাজ। সুতরাং যেখানেই কোনো দাঙ্গা হবে হিন্দু সমাজের প্রভাবশালীদেরই ধরতে হবে। মুসলমান ও খ্রিস্টানরা যেহেতু সংখ্যালঘু তাই তারা দাঙ্গা করতে পারে না।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে— এরকম অভিযোগ যে করবে, পুলিশ তাকেই গ্রেপ্তার করবে। অন্যদিকে, কোনো হিন্দুর বিরুদ্ধে যদি কেউ সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা সৃষ্টির অভিযোগ আনে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে পুলিশ অজামিনযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করবে, তখন প্রমাণ করতে হবে যে সে এরকম কোনো কাজ করেনি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী কে? —সেটুকু জানারও অধিকার থাকবে না।

খ্রিস্টান বা মুসলমান যদি হিন্দু দেব-দেবীর বিরুদ্ধে অবমানাকর মন্তব্য করে তবে তা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হবে। কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো ধর্মের অঙ্গ হবে, খ্রিস্টান মিশনারিরা অবাধে ধর্মান্তর করতে পারবে।’

পরিশেষে এটাই বলা যেতে পারে— এই দানবীয় বিল আইনে পরিণত হলে ভারতে যা ঘটতো তা কারও পক্ষেই সুখকর হতো না। হিন্দুদের চরম সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেওয়ার এক চক্রান্ত ছিল এই বিলের পরিকল্পনা।

—জহরলাল পাল,
শিলচর, অসম।

জ্বালানি সাশ্রয়ে মহিলাদের ভূমিকা

সুতপা বসাক ভড়

সম্প্রতি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধের আবহে পেট্রোলিয়ামজাত তেল ও গ্যাসের স্বাভাবিক সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে সহজভাবে তেল ও গ্যাস বহনকারী জাহাজগুলি যাতায়াত করতে পারছে না। ফলস্বরূপ ভারতেও পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের মতো জ্বালানি-সংকট দেখা দিয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন, সবাই যেন সংযত হয়ে পেট্রোলিয়ামজাত ইন্ধনগুলি ব্যবহার করেন। এগুলির মধ্যে মুখ্য হলো পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস ইত্যাদি। সকলেই জানি এগুলির প্রায় ৮৫ শতাংশ আমদানি হয় বিদেশ থেকে। সুতরাং, একদিকে যুদ্ধের জন্য ইন্ধন সংকট, অপরদিকে বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয়ের জন্য এগুলির ব্যবহার যথাসাধ্য সীমিত করার চেষ্টা করতে হবে।

রান্নার গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটি ঘরোয়া সিলিন্ডার ছোটো পরিবারে এক থেকে দেড় মাস পর্যন্ত চলে। আবার গ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি ইনডাকশান স্টোভ, মাইক্রোওয়েব ইলেকট্রিক কেটলি, কুকার ইত্যাদি ব্যবহার করি, তাহলে গ্যাসের খরচ বাঁচবে। গ্যাস আমরা যেন একটু সচেতনভাবে ব্যবহার করি, বাসনের তলাটা যেন ছড়ানো হয়। রান্নার সময় আগুনের শিখা যেন সম্পূর্ণ তলদেশ স্পর্শ করে। আগুনের শিখা যদি বাসনের বাইরে চলে যায়, তাহলে গ্যাসের অপচয় হয়। যতদূর সম্ভব কম আঁচে, ঢাকা দিয়ে রান্না করলে গ্যাসের অনেকটাই সাশ্রয় হয়। প্রেসার কুকারের ভেতরে অনেকে বিভিন্ন কৌটোয় করে একসঙ্গে ভাত, ডাল, তরকারি সেদ্ধ করে থাকেন। অনেকে ব্যবহার করেন প্রেসার কুকার। ইলেট্রিক উপকরণ যেমন ইনডাকশানে ভাত, ডাল, তরকারি খুব ভালো সেদ্ধ হয়। ইলেকট্রিক কেটলিতে গরম জল করে আমরা লিকার চা-এর আস্বাদন করতে পারি। আবার চাল-ডাল একটু ভিজিয়ে রেখে রান্না করলে খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়। ভাত

রান্নার সময় একবার ফুটে ওঠার পর গ্যাস বন্ধ করে দিতে হবে। দশ মিনিট পরে আবার গ্যাস জ্বেলে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিলেই সুন্দর ঝরঝরে ভাত তৈরি হয়। এজন্য টানা পনের কুড়ি মিনিট গ্যাস জ্বালানোর প্রয়োজন হয় না। এইভাবে চললে এক মাসের গ্যাস সহজেই দু'মাস পর্যন্ত চলে যায়। অনেকেই নিজ নিজ বুদ্ধির প্রয়োগ করে গ্যাসের সাশ্রয় করে থাকেন। পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে সহজেই এইসকল বিষয়ে অবহিত হতে পারি।

মনে রাখতে হবে যে, এইভাবে সুচিন্তিত উপায়ে ইন্ধন ব্যবহার করলে একটি গ্যাস সিলিন্ডার একমাসের পরিবর্তে দেড় বা দু' মাস চলতেই পারে। বছরে বারোটির পরিবর্তে আটটি সিলিন্ডারে কাজ হয়ে যাবে। এক লক্ষ পরিবারও যদি সচেতন হয়, তাহলে বছরে চার লক্ষ সিলিন্ডার সাশ্রয় হবে। বেশিরভাগ বাড়িতেই ফ্রিজ আছে, যেকোনো ব্যঞ্জন দু'দিনের মতো রান্না করলেও ইন্ধন সাশ্রয় হয়। এছাড়া বিদ্যুৎ চালিত উপকরণগুলিও আমরা সচেতন ভাবেই ব্যবহার করতে পারি। কোনো জিনিসেরই অপচয় ভালো নয়। এতে মা লক্ষ্মী রুষ্ট হন।

রান্নাঘরের দায়িত্বে মূলত মহিলারা থাকেন। তাঁরা অনায়াসেই তাঁদের নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির সমাধান করতে পারেন। দায়িত্বশীল নাগরিকরূপে বাড়ির অন্যান্য সদস্যরাও তাঁদের সহযোগিতা করবেন, এমনটাই কাম্য। খাবার সময় পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে খেতে বসলে বার বার খাবার গরম করতে হয় না। এর ফলে একদিকে যেমন ইন্ধন সাশ্রয় হয়, অপরদিকে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আন্তরিকতা অটুট থাকে। খাবারের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের সেদ্ধ, যা ভাতের সঙ্গেই সেদ্ধ হয়ে যায় এবং স্যালাড, পাঁপড়, দই রায়তা, আচার ইত্যাদির ব্যবহার করা যেতে পারে। জলখাবারে দুধ, দই, মুড়ি, চিঁড়ে, খই, ফল ইত্যাদি গ্রহণ করা যেতে পারে, যা সুস্বাদু ও পুষ্টির।

এছাড়া যানবাহনের ক্ষেত্রেও আমরা ব্যক্তিগত বাহনের ব্যবহার কম করে বাস, ট্রেন, অটো, টোটোতে যাতায়াত করতে পারি। অল্প দূরত্ব পায়ে হেঁটেও চলা যেতে পারে। বিদ্যুতের মাধ্যমে চলে এমন বাহন ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের এও মনে রাখতে হবে যে, পেট্রোলিয়ামজাত ইন্ধনগুলির জন্য আমরা অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীল। এই পরনির্ভরশীলতা কম করে 'আত্মনির্ভর ভারত' গঠনের জন্য আমাদের সকলেই সচেষ্ট হতে হবে। ভগবানের আশীর্বাদে আমাদের দেশে প্রচুর নদ নদী আছে। সেগুলির মাধ্যমে অনেকগুলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চলে। সেখান থেকে বেশিরভাগ বিদ্যুৎ তৈরি হয়। সেটি আমাদের নিজস্ব, সুতরাং স্ব-এর ব্যাপক প্রয়োগ যেন আমাদের জীবনে থাকে। তবে, সেক্ষেত্রেও আমরা অপচয় করব না, এমনটাই কাম্য। বিশ্বজুড়ে যে জ্বালানি সঙ্কট চলছে, তার সমাধান আমরা আমাদের মতো করেই করব। এর ফলে আমাদের 'স্ব'-বোধের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রারও সঞ্চয় ও সাশ্রয় হবে। ☐

বর্তমান সমাজ ও মানসিক অবসাদ

ডাঃ অরবিন্দ ব্রহ্ম

দৃশ্য-১ : ২১ বছরের সরমা নতুন বিয়ের পরে মাদকাসক্ত স্বামীর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারে সবসময় বিমর্ষ হয়ে থাকে। মাঝে মধ্যে সে মনে করে বেঁচে থেকে কী লাভ!

দৃশ্য-২ : ৩০ বছরের অনন্ত সরকারি স্কুলে চাকরি পেয়ে গৃহঋণ নিয়ে একটি ফ্ল্যাট কেনে এবং বিয়ে করে। কিছুদিন আগে সরকারি জটিলতায় তার চাকরি চলে গেছে। সে জানে না কীভাবে ঋণ পরিশোধ করবে। এখন সে চরম অবসাদে ভুগছে। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই এমন কিছু সময় আসে যখন তিনি দুঃখী অনুভব করেন। এটি সাধারণত বিশেষ কোনো কারণে হয়, দৈনন্দিন জীবনে খুব বেশি প্রভাব ফেলে না এবং সাধারণত এক বা দুই সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয় না। তবে এই বিষণ্ণতার অনুভূতি যদি দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলে যা আপনার জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলছে, তাহলে আপনার মধ্যে সম্ভবত মানসিক অবসাদ তৈরি হয়েছে।

মানসিক অবসাদের লক্ষণসমূহ :

● অসুখী, নিরাশ, অবসাদগ্রস্ততা। ● কিছু উপভোগ করতে পারছেন না। ● মানুষের সঙ্গে মেশার আগ্রহ এবং বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়েছেন। ● ক্লান্ত ও শক্তিহীন অনুভব হচ্ছে। ● উদ্বিগ্ন বা বিচলিত অনুভব হচ্ছে। ● সঠিকভাবে কাজে মনোনিবেশ করতে পারছেন না। ● যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন লাগছে। ● আত্মবিশ্বাস হারিয়েছেন। ● নিজেকে দোষী ও অযোগ্য মনে করছেন। ● আশাহীন এবং অনেক সময় আত্মহত্যার ভাবনাও শুরু করেছেন। ● ঘুম আসছে না বা বেশি ঘুমাতে পারছেন না। ● যৌনজীবনের প্রতি আগ্রহ নেই। ● খাওয়ার প্রতি আগ্রহ নেই।

মানসিক অবসাদ কেন হয়?

মনে রাখতে হবে, মানসিক অবসাদ দুর্বলতার কোনো লক্ষণ নয়। দৃঢ়চেতা ব্যক্তিদেরও এটি হতে পারে— বিখ্যাত রাজনীতিক, ক্রীড়াবিদ এবং চলচ্চিত্র জগতের তারকারাও মানসিক অবসাদে ভুগতে পারেন।

মানসিক অবসাদের কারণ :

কখনো কখনো মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হওয়ার একটি স্পষ্ট কারণ থাকবে, অনেক সময় নাও থাকতে পারে।

জীবনের ঘটনা এবং ব্যক্তিগত পরিস্থিতি :

● যেমন শোক, সম্পর্ক ভাঙন বা চাকরি হারানো।

● বন্ধু বা পরিবারহীন একাকী জীবন।

শারীরিক স্বাস্থ্য :

● ক্যানসার ও ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের মতো প্রাণঘাতী অসুস্থতা।

● দীর্ঘমেয়াদি এবং কষ্টদায়ক অসুস্থতা, যেমন আর্থ্রাইটিস।

● হরমোনের সমস্যা, যেমন সুপ্ত থাইরয়েড।

● অসুখ যা স্নায়ুকে প্রভাবিত করে।

শৈশবের ট্রমা :

● শারীরিক, যৌন অথবা মানসিক অত্যাচার ও অবহেলা।

● অস্থিতিশীল পারিবারিক পরিবেশ।

অ্যালকোহল ও মাদক ব্যবহার :

● নিয়মিত মদ্যপান করা অথবা গাঁজার মতো মাদক ব্যবহার করা বংশগত কারণ।

মানসিক অবসাদের চিকিৎসা :

● কোনো দুঃসংবাদ শুনলে বা শোকের সময় কাছের কোনো মানুষের সঙ্গে আপনার অনুভূতির ব্যাপারে কথা বলুন। ● যোগব্যায়াম বা হাঁটাহাঁটি আপনাকে শারীরিকভাবে সুস্থ রাখবে এবং আপনার ঘুম ভালো হবে। ● অ্যালকোহল আপনার মন অল্প সময়ের জন্য ভালো রাখতে পারে, তবে এটা দীর্ঘমেয়াদে আপনাকে আরও বেশি মানসিক অবসাদগ্রস্ত করে ফেলবে। একই কথা গাঁজা-সহ অন্যান্য মাদকের জন্যেও প্রযোজ্য। ● রাতে একই সময়ে শুতে যাওয়ার এবং সকালে একই সময়ে ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস করুন। ● আপনি সবসময় চিন্তিত অনুভব করলে যোগ ব্যায়াম, প্রাণায়াম, ম্যাসাজ ইত্যাদি করুন যা আপনাকে প্রশান্তি এনে দেয়। ● নিয়মিত কিছু সময় বই পড়া, ছবি আঁকা, গাছপালার পরিচর্যা করা কিংবা অন্য কোনো শখের কাজ করুন। ● মাঝে মধ্যে অল্প কিছুদিনের জন্য দৈনন্দিন চাপ ও চিন্তা থেকে নিজেকে একটু বিরতি দিন। ● সর্বদা মনে রাখবেন, অনেক মানুষ মানসিক অবসাদগ্রস্ততা কাটিয়ে সুস্থ হয়ে সমাজের মূলধারায় ফিরে এসেছেন।

মনস্তাত্ত্বিক হস্তক্ষেপ :

মানসিক অবসাদগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য অনেক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক হস্তক্ষেপ রয়েছে : কগনিটিভ বিহেভিয়েরাল থেরাপি, ইন্টারপার্সোনাল থেরাপি, সাইকোডায়নামিক লাইকোথেরাপি, কাপল থেরাপি (দম্পতিদের জন্য চিকিৎসা), সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং। প্রশিক্ষিত কাউন্সেলররা আপনার উপসর্গ ও সমস্যাগুলো বুঝে আপনাকে যথাযথ সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান করতে পারেন।

অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট (মানসিক অবসাদের ওষুধ)

যদি আপনার মানসিক অবসাদ মাঝারি বা গুরুতর হয় অথবা দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে, তাহলে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। ডাক্তারবাবু অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টের একটি কোর্সের পরামর্শ দিতে পারেন। মনে রাখবেন, মানসিক অবসাদে ভোগা ব্যক্তিদের মধ্যে অনেক মানুষ আত্মহত্যা করতে পারেন বা করার চেষ্টা করতে পারেন। আপনার পরিচিত কারও মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা নিয়ে আপনি উদ্বিগ্ন হলে তার সঙ্গে আত্মহত্যার চিন্তা ও অনুভূতি নিয়ে কথা বলুন এবং শীঘ্রই মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দিন।

(লেখক সভাপতি, সক্ষম, পশ্চিমবঙ্গ)

উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার

গত ৯ মে শপথগ্রহণের পর একের পর এক দৃঢ় প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে নবনির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সংকল্পপত্র-আধারিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যথোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন রাজ্য প্রশাসন। বিগত ১৫ বছরে রাজ্য জুড়ে যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে এবং নারী নির্যাতনের যে অপরাধগুলি সংঘটিত হয়েছে— সেই সংক্রান্ত অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখতে দু'টি তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর তত্ত্বাবধানে প্রথম কমিশনটি পরিচালিত হবে। কমিশনের সদস্য-সচিবের দায়িত্ব নির্বাহ করবেন বরিষ্ঠ আইপিএস আধিকারিক কে. জয়রামন। কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে দ্বিতীয় কমিশনটি পরিচালিত হবে। কমিশনের সদস্য-সচিব হলেন বরিষ্ঠ আইপিএস আধিকারিক দময়ন্তী সেন। ১ জুন থেকে দু'টি কমিশন তাদের কাজ শুরু করবে।

গত ১৮ মে রাজ্য মন্ত্রীসভার দ্বিতীয় বৈঠকে অনুমোদিত হয় 'অন্নপূর্ণা যোজনা'। ১ জুন থেকে রাজ্যের সব সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে সফর এবং রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন গঠনে অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রীসভা। জুন মাস থেকে উপাসনাপদ্ধতিগত শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিতে সমস্ত প্রকল্প বন্ধ-সহ ইমাম-মোয়াজ্জেম ভাতা বিলোপেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্যের সরকারি ক্যান্টিনগুলিতে মাত্র ৫ টাকায় 'মাছ-ভাত' খাবারের ব্যবস্থা চালু করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত এই প্রকল্পের ফলে অত্যন্ত সাশ্রয়ী ও পুষ্টিকর খাবারের মাধ্যমে উপকৃত হবেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের দিনমজুর, শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী-সহ স্বল্প আয় সম্পন্ন পরিবারগুলি। রাজ্যে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০' কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে তিনি মেধার ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়নের বিষয়টিতে জোর দিতে বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছেন। গত ১৩ মে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী, রাজ্যে সমস্ত সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলে প্রার্থনার সময় 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেই সিদ্ধান্তেরই সম্প্রসারণ হিসেবে, গত ১৯ মে মাদ্রাসা শিক্ষা ডিরেক্টরেট-এর জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের সব মাদ্রাসায় এবার থেকে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া বাধ্যতামূলক। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, এবার থেকে সরকার পরিচালিত, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও স্বীকৃত সব মাদ্রাসায় প্রতিদিন ক্লাস শুরুর আগে 'বন্দে মাতরম্' গাইতে হবে। রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে জাতীয় চেতনা ও ঐক্যের ভাবনা জোরদার করা।

একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এটি কোনো ধর্মীয় নির্দেশ নয়, বরং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক অভিন্ন নীতি কার্যকর করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ। নাগরিকদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় এবং নাগরিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে, জনসাধারণের নানা অভাব-অভিযোগ নিবারণের উদ্দেশ্যে গত ১৮ মে বিধাননগর-স্থিত রাজ্য বিজেপি কার্যালয়ে 'জনতার দরবার'-এর সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীও শিলিগুড়ি-স্থিত সচিবালয় 'উত্তরকন্যা'তে প্রতি সপ্তাহে 'জনতার দরবার' অধিবেশন পরিচালনা করবেন। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় প্রকল্প 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'-এর সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। দার্জিলিং, কালিম্পং, আসানসোল ও দুর্গাপুরে আগামীদিনে শুরু হতে চলেছে 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'-এর অধীনে ২০০ কোটি টাকার

পাইলট প্রকল্প। গত ১৫ মে আসানসোলের জাহাঙ্গির মহল্লায় স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে উন্মত্ত জেহাদিরা। তিলজলায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙা বন্ধ-সহ রাস্তা দখল করে নমাজ পড়ার দাবিতে গত ১৭ মে পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিঙে জেহাদিরা কলকাতা পুলিশের কর্মরত আধিকারিক ও পুলিশকর্মীদের ওপর ইট ও পাথর বর্ষণ করে। দু'টি ঘটনাতেই কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ-প্রশাসন। আসানসোলের ঘটনায় ৩৫ জন এবং পার্ক সার্কাসের ঘটনায় ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

কলকাতায় লিপস্ অ্যান্ড বাউন্ডস্ কোম্পানি, আত্মীয়-স্বজন ও অভিষেক ব্যানার্জির নিজস্ব নামে মোট ৪৩টি স্থাবর সম্পত্তির হদিশ পেয়েছে রাজ্য প্রশাসন। বিভিন্ন ঠিকানায় অবস্থিত এই সম্পত্তিগুলিতে বেআইনি নির্মাণ রয়েছে বলে প্রশাসনের কাছে খবর থাকায় ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের পক্ষ থেকে সেগুলিতে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। অভিষেক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে একাধিক এফআইআর দায়ের হওয়ার কারণে কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন তিনি। গত ২১ মে একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত অভিষেক ব্যানার্জির রক্ষাকবচ মঞ্জুর করেছে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চ। ঘনিষ্ঠ শাগরেদ ও প্রোমোটার অমিত চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হওয়ার পর কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের জন্য আবেদন জানিয়েছেন তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তী ও তার স্ত্রী অদিতি মুন্সি। ২০২৪-এর ৫ জানুয়ারি শেখ শাজাহানের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে যাওয়া কর্তব্যরত ইডি আধিকারিকদের আক্রমণের ঘটনায় অভিযুক্ত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের দুই নেত্রী— সবিতা রায় ও মিঠু সর্দার। ঘটনার পর পলাতক এই দুই নেত্রীকে গত ২০ মে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইতিমধ্যেই সীমান্তে ২৭ কিমি কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য জমি বিএসএফ-কে হস্তান্তর করা হয়েছে।

একনজরে ২০২৬-পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল (পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিধানসভা কেন্দ্র : ২২৯— ডেবরা
জয়ী : শুভাশিস ওম (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৪,৪৬৩
পরাজিত : রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৫,৬৬২
জয়ের ব্যবধান : ২৮,৮০১

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৩০— দাসপুর
জয়ী : তপন কুমার দত্ত (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩৩,০৭১
পরাজিত : আশিস হুদাইত (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০০,৯৩৭
জয়ের ব্যবধান : ৩২,১৩৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৩১— ঘাটাল (তপশিলি জাতি)
জয়ী : শীতল কপাট (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩১,৫৫০
পরাজিত : শ্যামলী সর্দার (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৩,৮৯৩
জয়ের ব্যবধান : ৩৭,৬৫৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৩২— চন্দ্রকোণা (তপশিলি জাতি)
জয়ী : সুকান্ত দোলুই (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৪০,৫১৭
পরাজিত : সূর্যকান্ত দোলোই (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৭,০৩৬
জয়ের ব্যবধান : ৩৩,৪৮১

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৩৩— গড়বেতা (তপশিলি জাতি)
জয়ী : প্রদীপ লোধা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৩,৭৫২
পরাজিত : উত্তরা সিংহ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৭,৫২৭
জয়ের ব্যবধান : ২৬,২২৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৩৪— শালবনী
জয়ী : বিমান মাহাত (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩২,৮৫৬
পরাজিত : শ্রীকান্ত মাহাত (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৭,৬১৩
জয়ের ব্যবধান : ১৫,২৪৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৩৫— কেশপুর (তপশিলি জাতি)
জয়ী : শিউলি সাহা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,৪৩,১২৩
পরাজিত : শুভেন্দু সামন্ত (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৩,০১৮
জয়ের ব্যবধান : ৫০,১০৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৩৬— মেদিনীপুর
জয়ী : শঙ্কর কুমার গুছাইত (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩৩,০৪১
পরাজিত : সুজয় হাজরা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৪,২৯৪
জয়ের ব্যবধান : ৩৮,৭৪৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৩৭— বিনপুর (তপশিলি উপজাতি)
জয়ী : ডাঃ প্রণত টুডু (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৭,২৩৮
পরাজিত : বীরবাহা হাঁসদা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৪,২৬১
জয়ের ব্যবধান : ২২,৯৭৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৩৮— বান্দোয়ান (তপশিলি উপজাতি)
জয়ী : লাবসেন বাস্কে (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩৪,০৮০
পরাজিত : রাজীব লোচন সরেন (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৪,৫০৩
জয়ের ব্যবধান : ২৯,৫৭৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৩৯— বলরামপুর
জয়ী : জলধর মাহাতো (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৮,৪২১
পরাজিত : শান্তিরাম মাহাতো (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৩,৩৭০
জয়ের ব্যবধান : ৩৫,০৫১

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৪০— বাঘমুণ্ডি
জয়ী : রহিদাস মাহাতো (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১২,৬৬৩
পরাজিত : সুশান্ত মাহাতো (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭১,৮৪৬
জয়ের ব্যবধান : ৪০,৮১৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৪১— জয়পুর
জয়ী : বিশ্বজিৎ মাহাতো (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৪,৬৬৮
পরাজিত : অর্জুন মাহাতো (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮২,৪৫০
জয়ের ব্যবধান : ২২,২১৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৪২— পুরুলিয়া
জয়ী : সুদীপকুমার মুখোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৮,৪৫৪
পরাজিত : সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৯,২০১
জয়ের ব্যবধান : ৪৯,২৫৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৪৩— মানবাজার (তপশিলি উপজাতি)
জয়ী : ময়না মুর্মু (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২০,৪৮৭
পরাজিত : সন্ধ্যারানি টুডু (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৩,২০৪
জয়ের ব্যবধান : ২৭,২৮৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৪৪— কাশীপুর
জয়ী : কমলাকান্ত হাঁসদা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৬,৫৭১
পরাজিত : সৌমেন বেলথরিয়া (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৫,২৯৫
জয়ের ব্যবধান : ২১,২৭৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৪৫— পাড়া (তপশিলি জাতি)
জয়ী : নদীয়ারচাঁদ বাউরি (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৩,৪৮৮
পরাজিত : মানিক বাউরি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৯,৭৬৭
জয়ের ব্যবধান : ৩৩,৭২১

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৪৬— রঘুনাথপুর (তপশিলি জাতি)
জয়ী : মামণি বাউরি (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৭,৬২৮
পরাজিত : হাজারী বাউরি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৩,৫৬৯
জয়ের ব্যবধান : ৪৪,০৫৯

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৪৭— শালতোড়া (তপশিলি জাতি)
জয়ী : চন্দনা বাউরি (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৫,১৮০
পরাজিত : উত্তম বাউরি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৩,০৪৫
জয়ের ব্যবধান : ৩২,১৩৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৪৮— ছাতনা
জয়ী : সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৫,৯৭২
পরাজিত : স্বপনকুমার মণ্ডল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৮,৭৯৮
জয়ের ব্যবধান : ৪৭,১৭৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৪৯— রানিবাঁধ (তপশিলি উপজাতি)
জয়ী : ক্ষুদিরাম টুডু (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩১,১৪৫
পরাজিত : ডাঃ তনুশ্রী হাঁসদা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৮,৮৭৬
জয়ের ব্যবধান : ৫২,২৬৯

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৫০— রাইপুর (তপশিলি উপজাতি)
জয়ী : ক্ষেত্রমোহন হাঁসদা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১১,৪৪৩
পরাজিত : ঠাকুরমণি সরেন (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮২,৭০১
জয়ের ব্যবধান : ২৮,৭৪২

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৫১— তালডাংরা
জয়ী : শৌভিক পাত্র (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৪,৫৩৭
পরাজিত : ফাল্গুনী সিংহবাবু (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৪,৪৬৪
জয়ের ব্যবধান : ৫০,০৭৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৫২— বাঁকুড়া
জয়ী : নীলাদ্রি শেখর দানা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩৬,৯৯২
পরাজিত : ডাঃ অনুপ মণ্ডল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮২,৮১৫
জয়ের ব্যবধান : ৫৪,১৭৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৫৩— বড়জোড়া
জয়ী : বিল্লেশ্বর সিংহ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৫,৪১৯
পরাজিত : গৌতম মিশ্র (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৪,১০৯
জয়ের ব্যবধান : ৪১,৩১০

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৫৪— ওন্দা
জয়ী : অমরনাথ শাখা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৮,২৯৬
পরাজিত : সুব্রত দত্ত (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৬,৫৭৩
জয়ের ব্যবধান : ৩১,৭২৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৫৫— বিষ্ণুপুর
জয়ী : শুক্লা চট্টোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১১,০৮২
পরাজিত : তন্ময় ঘোষ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮০,৪৭৭
জয়ের ব্যবধান : ৩০,৬০৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৫৬— কোতুলপুর (তপশিলি জাতি)
জয়ী : লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৬,২৪১
পরাজিত : হরকালী প্রতিহার (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯১,৮৭৪
জয়ের ব্যবধান : ৩৪,৩৬৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৫৭— ইন্দাস (তপশিলি জাতি)
জয়ী : নির্মলকুমার ধারা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৮,৭৩৩
পরাজিত : শ্যামলী রায় বাগদী (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৭,৮৩৩
জয়ের ব্যবধান : ৯০০

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৫৮— সোনামুখী (তপশিলি জাতি)
জয়ী : দিবাকর ঘরামি (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৫,৫৪৯
পরাজিত : ডাঃ কল্লোল সাহা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৬,১৩৯
জয়ের ব্যবধান : ২৯,৪১০

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৫৯— খণ্ডঘোষ (তপশিলি জাতি)
জয়ী : নবীনচন্দ্র বাগ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৪,১৮৩
পরাজিত : গৌতম ধারা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৫,৮৯৯
জয়ের ব্যবধান : ৮,২৮৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৬০— বর্ধমান দক্ষিণ
জয়ী : মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৭,৭৫৪
পরাজিত : খোকন দাস (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৭,২৮৪
জয়ের ব্যবধান : ৩০,৪৭০

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৬১— রায়না (তপশিলি জাতি)
জয়ী : সুভাষ পাত্র (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৩,৪৮৭
পরাজিত : মন্দিরা দলুই (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০২,৬৫৩
জয়ের ব্যবধান : ৮৩৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৬২— জামালপুর (তপশিলি জাতি)
জয়ী : অরুণ হালদার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৯,৯৩৬
পরাজিত : ভূতনাথ মালিক (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৮,৭৫৮
জয়ের ব্যবধান : ১১,১৭৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৬৩— মন্তেশ্বর
জয়ী : সৈকত পাঁজা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৬,৫৫৯
পরাজিত : সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮১,৭৬১
জয়ের ব্যবধান : ১৪,৭৯৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৬৪— কালনা (তপশিলি জাতি)
জয়ী : সিদ্ধার্থ মজুমদার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৬,৫৫৯
পরাজিত : দেবপ্রসাদ বাগ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮১,৭৬১
জয়ের ব্যবধান : ১৪,৭৯৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৬৫— মেমারি
জয়ী : মানব গুহ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৬,৪২৮
পরাজিত : রাসবিহারী হালদার (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৯,৩২২
জয়ের ব্যবধান : ৭,১০৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৬৬— বর্ধমান উত্তর (তপশিলি জাতি)
জয়ী : নিশীথকুমার মালিক (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১২,৬৮৮
পরাজিত : সঞ্জয় দাস (বিজেপি) ; প্রাপ্ত ভোট : ১,০৬,২২৮
জয়ের ব্যবধান : ৬,৪৬০

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৬৭— ভাতার
জয়ী : সৌমেন কার্ফা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৮,৮২০
পরাজিত : শান্তনু কোঙার (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯২,২৯২
জয়ের ব্যবধান : ৬,৫২৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৬৮— পূর্বস্থলী দক্ষিণ
জয়ী : প্রাণকৃষ্ণ তপাদার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১১,০০৪
পরাজিত : স্বপন দেবনাথ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৪,৩৪২
জয়ের ব্যবধান : ১৬,৬৬২

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৬৯— পূর্বস্থলী উত্তর
জয়ী : গোপাল চট্টোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১১,৩৭৯
পরাজিত : বসুন্ধরা গোস্বামী (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮১,১৫৩
জয়ের ব্যবধান : ৩০,২২৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৭০— কাটোয়া
জয়ী : কৃষ্ণ ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২২,০২০
পরাজিত : রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৬,৯৫৪
জয়ের ব্যবধান : ৩৫,০৬৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৭১— কেতুগ্রাম
জয়ী : অনাদি ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১১,১০৪
পরাজিত : শেখ শাহনওয়াজ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৩,৪৯৪
জয়ের ব্যবধান : ২৭,৬১০

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৭২— মঙ্গলকোট
জয়ী : শিশির ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৪,০২০
পরাজিত : অপূর্ব চৌধুরী (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯১,২৯৭
জয়ের ব্যবধান : ১২,৭২৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৭৩— আউশগ্রাম (তপশিলি জাতি)
জয়ী : কলিতা মাজি (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৭,৬৯২
পরাজিত : শ্যামাপ্রসন্ন লোহাড় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৫,১৫৭
জয়ের ব্যবধান : ১২,৫৩৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৭৪— গলসি (তপশিলি জাতি)
জয়ী : রাজু পাত্র (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১০,৬৪০
পরাজিত : অলোক কুমার মাঝি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০০,১৪৬
জয়ের ব্যবধান : ১০,৪৯৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৭৫— পাণ্ডবেশ্বর
জয়ী : জিতেন্দ্রকুমার তিওয়ারি (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৮০,৫০১
পরাজিত : নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৯,১০৩
জয়ের ব্যবধান : ১,৩৯৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৭৬— দুর্গাপুর পূর্ব
জয়ী : চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৮,৮৮৮
পরাজিত : প্রদীপ মজুমদার (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৭,৯৫৪
জয়ের ব্যবধান : ৩০,৯৩৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৭৭— দুর্গাপুর পশ্চিম
জয়ী : লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোড়ুই (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৪,৭২৯
পরাজিত : কবি দত্ত (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৭,১৩১
জয়ের ব্যবধান : ৩৭,৫৯৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৭৮— রানিগঞ্জ
জয়ী : পার্থ ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৭,৪১৬
পরাজিত : কালোবরণ মণ্ডল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৯,৬৩০
জয়ের ব্যবধান : ১৭,৭৮৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৭৯— জামুরিয়া
জয়ী : ড. বিজন মুখোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯০,১৫০
পরাজিত : হরেরাম সিংহ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৬৭,৬৩৬
জয়ের ব্যবধান : ২২,৫১৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৮০— আসানসোল দক্ষিণ
জয়ী : অগ্নিমিত্রা পাল (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৯,৫৮২
পরাজিত : তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৮,৭৪৩
জয়ের ব্যবধান : ৪০,৮৩৯

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৮১— আসানসোল উত্তর
জয়ী : কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৪,৫১৬
পরাজিত : মলয় ঘটক (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯২,৯০১
জয়ের ব্যবধান : ১১,৬১৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৮২— কুলটি
জয়ী : অজয়কুমার পোদ্দার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৩,৫৭০
পরাজিত : অভিজিৎ ঘটক (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৭,০৭২
জয়ের ব্যবধান : ২৬,৪৯৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৮৩— বারাবনী
জয়ী : অরিজিৎ রায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯১,৭৭৭
পরাজিত : বিধান উপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮০,০৫৫
জয়ের ব্যবধান : ১১,৭২২

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৮৪— দুবরাজপুর (তপশিলি জাতি)
জয়ী : অনুপকুমার সাহা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৭,৪৩৭
পরাজিত : নরেশচন্দ্র বাউরি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৯,৭৯০
জয়ের ব্যবধান : ২৭,৬৪৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৮৫— সিউড়ি
জয়ী : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৪,২৪৩
পরাজিত : উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৫,৫৫৭
জয়ের ব্যবধান : ২৮,৬৮৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৮৬— বোলপুর
জয়ী : চন্দ্রনাথ সিংহ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৪,৯১৫
পরাজিত : দিলীপ ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০১,৭২৭
জয়ের ব্যবধান : ১৩,১৮৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৮৭— নানুর
জয়ী : বিধানচন্দ্র মাঝি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৯,৯১০
পরাজিত : খোকন দাস (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১১,৭৮৮
জয়ের ব্যবধান : ৮,১২২

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৮৮— লাভপুর
জয়ী : দেবাশিস ওঝা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৬,৪০২
পরাজিত : অভিজিৎ সিংহ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০২,৮৫২
জয়ের ব্যবধান : ৩,৫৫০

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৮৯— সাঁইথিয়া (তপশিলি জাতি)
জয়ী : কৃষ্ণকান্ত সাহা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৫,০৫৪
পরাজিত : নীলাবতী সাহা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৪,৭৪৮
জয়ের ব্যবধান : ১০,৩০৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৯০— ময়ূরেশ্বর
জয়ী : দুধকুমার মণ্ডল (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৭,০৫৬
পরাজিত : অভিজিৎ রায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৬,০৫৪
জয়ের ব্যবধান : ২১,০০২

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৯১— রামপুরহাট
জয়ী : ধ্রুব সাহা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১১,৯২০
পরাজিত : আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৭,৬৮৭
জয়ের ব্যবধান : ২৪,২৩৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৯২— হাঁসন
জয়ী : ফয়জুল হক (কাজল শেখ) (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৩,২২৩
পরাজিত : নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রাপ্ত ভোট : ৭৪,৯২৫
জয়ের ব্যবধান : ২৮,২৯৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৯৩— নলহাটি
জয়ী : রাজেন্দ্র প্রসাদ সিংহ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৭,৭৪৪
পরাজিত : অনিল কুমার সিংহ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭৪,২৯৮
জয়ের ব্যবধান : ১৩,৪৪৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ২৯৪— মুরারই
জয়ী : ড. মোশারফ হোসেন (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৬,৯০২
পরাজিত : রিঙ্কি ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৫৮,৬৬৪
জয়ের ব্যবধান : ৩৮,২৩৮

ফ ঃ ৪

নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ দ্বিতীয়'র শুভারম্ভ

গত ১১ মে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ দ্বিতীয়'র শুভারম্ভ হলো নাগপুরের রেশিমবাগ স্থিত ডাঃ হেডগেওয়ার স্মৃতি ভবন পরিসরের মহর্ষি ব্যাস সভাকক্ষে। সঙ্ঘ শতাব্দী বর্ষের এই বর্গের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহসরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর, সহ সরকার্যবাহ তথা বর্গের পালক অধিকারী অতুল লিময়ে এবং বর্গের সর্বাধিকারী জয়পুর প্রান্ত সঙ্ঘচালক মহেন্দ্র সিংহ মগ্গো। উপস্থিত অধিকারীগণ ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে বর্গের শুভারম্ভ করেন। সারা দেশ থেকে ৮৮০ জন শিক্ষার্থী এই বর্গে অংশগ্রহণ করেছেন। ২৫ দিনের এই বর্গ আগামী ৪ জুন পর্যন্ত চলবে। এই বর্গে উত্তরবঙ্গ ১৮, মধ্যবঙ্গ ১৮ এবং দক্ষিণবঙ্গের ১৭ কার্যকতা অংশগ্রহণ করেছেন।

উদ্বোধনী ভাষণে সহসরকার্যবাহ অতুল লিময়েজী বলেন, আমাদের জন্ম ভারতবর্ষে হয়েছে। সঙ্ঘের সম্পর্কে এসে স্বয়ংসেবক হয়েছি এবং সঙ্ঘের শতাব্দী বর্ষে কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ দ্বিতীয়তে অংশগ্রহণ করা, এটি আমাদের সৌভাগ্য। সঙ্ঘের শতবর্ষের যাত্রায় আমাদের উপহাস, উপেক্ষা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনবার নিষেধাজ্ঞা ভোগ করতে হয়েছে, তাসত্ত্বেও স্বয়ংসেবকদের পরিশ্রম, ত্যাগ, সংঘর্ষ ও বলিদানের কারণে সঙ্ঘ এগিয়ে চলেছে। সাধারণ স্বয়ংসবকরাই সঙ্ঘকে অসাধারণ করে তুলেছেন। সঙ্ঘের ব্যক্তি নির্মাণের প্রক্রিয়াটি বিকেন্দ্রিত। ব্যক্তিনির্মাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হলো নিত্য শাখা। সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ ব্যক্তিনির্মাণেরই একটি অংশ। ১৯২৭ সাল থেকে সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ বর্গ শুরু হয়েছে। সময় অনুসারে বর্গের পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু ভারত হিন্দুরাষ্ট্র, এই রাষ্ট্রকে পরম বৈভবশালী করার জন্য সম্পূর্ণ সমাজের সংগঠন এবং সমাজ সংগঠনের জন্য ব্যক্তি নির্মাণের প্রক্রিয়া — এই তিনটি মৌলিক বিষয় অপরিবর্তিত রয়েছে। নাগপুরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে এই বর্গের গুরুত্ব অসাধারণ। শরীরের সঙ্গে মনেরও পরিপূর্ণতা প্রয়োজন। এর জন্যই এই প্রশিক্ষণের আয়োজন।

অতুলজী বলেন, স্বাধীনতার অমৃতকালের সাক্ষী থাকার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। এই বর্গে তার লাভ তুলতে হবে। বর্গে শারীরিক, বৌদ্ধিক প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আলাদা এক অনুভূতি হবে। সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বন্ধুদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার কারণে 'আমরা সবাই এক' এই অনুভূতি এই বর্গে পাওয়া যাবে। তথাগত বুদ্ধ বলতেন, 'আমি মুক্তির পথের কথা বলছি কিন্তু পৌঁছতে পারবে তারাই যারা সেই পথে নিরন্তর চলতে থাকবে।' লক্ষ্য প্রাপ্তির পথে চলার জন্য স্বয়ংসেবকদের তৈরি হওয়ার জন্য এই প্রশিক্ষণ বর্গের আয়োজন।

ওড়িশার সম্বলপুরে কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ প্রথম-এ উত্তরবঙ্গ ৪৩, মধ্যবঙ্গ ৬৯ এবং দক্ষিণবঙ্গের ৬০ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ (সাধারণ) শুরু হয়েছে গত ৯ মে রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দির (বাংলা বিভাগ) পরিসরে। তাতে ১৬১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন।

মধ্যবঙ্গ প্রান্তের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ (সাধারণ) শুরু হয়েছে গত ২৩ মে নদীয়া জেলার শান্তিপুরে। তাতে ২৮৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ (সাধারণ) শুরু হয়েছে গত ১৭ মে হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা বিদ্যামন্দির পরিসরে। তাতে ১৭৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। তিন বঙ্গের মিলিত সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ (বিশেষ) শুরু হয়েছে গত ১৭ মে বীরভুম জেলার তারাপুর সরস্বতী শিশু মন্দিরে। তাতে ১৯৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গ ৪৬, মধ্যবঙ্গ ৮৫ এবং দক্ষিণবঙ্গের ৬৫ জন অংশগ্রহণ করেছেন।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ বিদ্যালয় শিক্ষার রাজ্য কার্যকারিণীর বৈঠক

গত ১১ মে কলকাতা বুদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভাগৃহে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ বিদ্যালয় শিক্ষার রাজ্য কার্যকারিণীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী মহেন্দ্র কাপুর, পূর্বক্ষেত্র সংগঠন মন্ত্রী আলোক চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক-সহ রাজ্য ও জেলাস্তরের শতাধিক কার্যকর্তা। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক জয়ন্ত রায়চৌধুরী। বৈঠকের শুরুতে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী প্রদীপ প্রজ্বলন, সরস্বতী বন্দনা ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। আগত বিশেষ অতিথি-সহ উপস্থিত কার্যকর্তাদের সঙ্গে পরিচয়-সহ সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমের পর্যালোচনা করেন রাজ্য সম্পাদক বাপি প্রামাণিক।

বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার গঠনে কার্যকর্তাদের বিশেষ ভূমিকা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের অনুভব কথন-সহ এবছরের সদস্যতাকরণের পরিকল্পনা, গত দিনের কার্যসমীক্ষা, আগামীদিনে সংগঠনের আর্থিক স্থিতি, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণে করণীয় কাজ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বৈঠকের দ্বিতীয় সত্রে প্রতিটি জেলার প্রমুখ কার্যকর্তারা নিজ নিজ জেলার সদস্যতাকরণ এবং পরবর্তী কর্মসূচির পরিকল্পনা সবার সামনে তুলে ধরেন। বিভিন্ন সত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তারা সংগঠনের বিস্তার, মিডিয়া টোলির গুরুত্ব, 'আমার বিদ্যালয় আমার তীর্থ' কার্যক্রম, অষ্টমশ্রেণীর ইতিহাস বইয়ের বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রধান শিক্ষকমহাশয়দের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের যোজনা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বিচার-বিমর্শ করেন। রাজ্য জুড়ে 'আমার বিদ্যালয় আমার তীর্থ' কার্যক্রমে কার্যকর্তারা নিজেদের বিদ্যালয়কে তীর্থজ্ঞানে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টমশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মেধা অন্বেষণ অভীক্ষা-সহ ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে প্রতিবছরের মতো জেলায় জেলায় মক টেস্টের আয়োজন করা হবে বলে যোজনা গ্রহণ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার গঠনে কার্যকর্তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণের জন্য মহেন্দ্র কাপুরজী সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে কার্যকর্তাদের আরও বেশি দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়ে অবহিত করেন। একজন আদর্শ কার্যকর্তা এবং একজন আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী সকলকে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। এ ছাড়াও সংগঠনের বিস্তার বিষয়ক বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেন। বৈঠকের অন্তিম সত্রে সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক জয়ন্ত রায়চৌধুরী সারাদিন ব্যাপী বৈঠকের বিভিন্ন বিষয়ের পর্যালোচনা করে সঙ্ঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করার পরামর্শ দেন। রাজ্য সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডলের সমাপ্তি ভাষণের পর বৈঠকের সমাপ্তি ঘটে।

সিউড়ী অরবিন্দপল্লী সরস্বতী শিশুমন্দির সোসাইটি ও মাতৃ ভারতীর উদ্যোগে রক্তদান শিবির

সিউড়ী অরবিন্দপল্লী সরস্বতী শিশু মন্দির সোসাইটির উদ্যোগে এবং মাতৃ ভারতীর সহযোগিতায় গত ১৭ মে সিউড়ী শহরের শ্যামাপ্রসাদ মোড় সংলগ্ন সরস্বতী শিশু মন্দিরে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন সিউড়ী সদর হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ রাহুল মিশ্র এবং শিশুমন্দির পরিচালন সমিতির জেলা প্রমুখ বিশ্বনাথ দে। উপস্থিত ছিলেন শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য নির্মল ঠাকুর। পুরুষ মহিলা মিলে ২০ জন রক্ত দান করেন। রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অমিয় মণ্ডল, দেবব্রত মহান্ত, মলয় চট্টোপাধ্যায়, পতিত পাবন বৈরাগ্য-সহ বহু বিশিষ্ট নাগরিক।

মালদা জেলা সংস্কার ভারতীর রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপন

সংস্কার ভারতী মালদা জেলার উদ্যোগে মালদা শহরের বদ্রীনাথ দাস সরস্বতী শিশু মন্দিরে গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক কিশোর কুমার সরকার, প্রান্ত কোষাধ্যক্ষ জয়নারায়ণ চৌধুরী, প্রান্ত সাহিত্য বিধা প্রমুখ শুভঙ্কর দাস, জেলা সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার, জেলা সম্পাদক শ্যামল কুমার কুণ্ডু, সহ সম্পাদিকা শ্রীমতী রুমা দে, জেলা কোষাধ্যক্ষ সজল দত্ত প্রমুখ। প্রদীপ প্রজ্বলন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্য নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। সংস্কার ভারতীর ধ্যেয়গীত পরিবেশনের পর শিশুশিল্পীদের আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশিত হয়।

স্বাগত ভাষণ দেন শ্যামল কুণ্ডু। এরপর সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা পর পর সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সংগঠন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কিশোর কুমার সরকার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পরেশ চন্দ্র সরকার। জাতীয় সঙ্গীত ও রাষ্ট্রবন্দনার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

সমাজ সেবা ভারতী, ঠাকুরপুকুর ভাগের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

সমাজ সেবা ভারতী ঠাকুরপুকুর ভাগের উদ্যোগে গত ১৭ মে সন্ধ্যায় ঠাকুরপুকুর মুক্তমঞ্চে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী পার্থ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরপুকুর ভাগের সঙ্ঘের সঙ্ঘচালক সন্দীপ ঘোষ, সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সেবাপ্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ। ঠাকুরপুকুর ভাগের ৮টি শিশু সংস্কার কেন্দ্রের সেবিকা ও ছোটো ছোটো ভাই-বোনেদের নাচ, গান, আবৃত্তি ও প্রার্থনা সঙ্গীত উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে ৫৬ জন দুঃস্থ ছেলে-মেয়ের হাতে খাতা-কলম তুলে দেওয়া হয়। শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা রায়, শ্রীমতী মাধবী দাস, শ্রীমতী পূরবী মজুমদার, শ্রীমতী প্রতিমা পাল-সহ ২০ জন সেবিকা বোনেদের নিয়ে গীতিআলেখ্য 'ভারত আমার ভারতবর্ষ' পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঠাকুরপুকুর ভাগের সেবা প্রমুখ অপূর্ব মজুমদার। সহযোগিতায় ছিলেন সমাজ সেবা ভারতীর রাজ্য সম্পাদক রিপন দাস এবং ঠাকুরপুকুর ভাগের কার্যবাহ রতন মল্লিক।

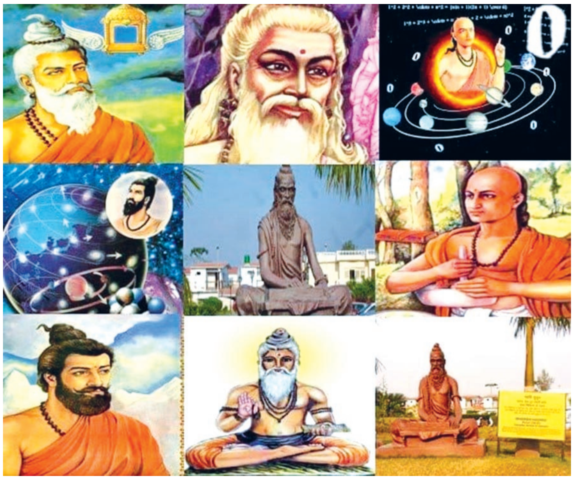

বিজ্ঞান সাধনায় প্রাচীন ভারতবর্ষ

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

সনাতন ভারতবর্ষ যে প্রাচীনকাল থেকেই বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের পথপ্রদর্শক ছিল, সেই ধারণা যে ভ্রান্ত নয় তা আজকের দিনে পাশ্চাত্য বিশ্ব ঢোঁক গিলে হলেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

'প্রাচীন ভারতবাসী ছিল ভাবপ্রবণ ও বাস্তববিমুখ'— এই অনৃত ভাষণ ভারতবাসীদের দাগিয়ে দেওয়ার পেছনে রয়েছে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং এদেশের বিদেশি ভাবধারা ও অর্থে পুষ্ট কিছু মানুষের বিকৃতকামী মানসিকতা।

হাজার হাজার বছরের প্রাচীন বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণগুলির অনন্যতা সূচিত করে সনাতন ভারতের বিজ্ঞান সাধনার গৌরব-গরিমা; তার উৎকর্ষতা।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের শ্রদ্ধেয় গুরুদেব শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজী বলেছিলেন— 'জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান; শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের সারাংশই বিজ্ঞান। তত্ত্ববস্তুকে সামান্যভাবে জানার নাম জ্ঞান; আর উহার অশেষ বিশেষ জানিয়া উহাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের অধীন করার নাম বিজ্ঞান।' (সূর্য বিজ্ঞান— শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, পৃষ্ঠা-৪)। ভারতের বিজ্ঞান-ঋষিরা তাই জড় ও চৈতন্যের সীমানা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন তাঁদের অসাধারণ মেধা শক্তির দ্যুতিতে; সে কথা অনস্বীকার্য। প্রাচীন ভারতবর্ষ কাব্য বা দর্শনেই নয়, প্রকৃত বিজ্ঞান চর্চাও করেছিল সেই পর্যায়ে; যেখানে স্বাধীন চিন্তা যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যে না উপনীত হয়েছে! তাই উপনিষদের ঋষি উচ্চকণ্ঠে সেই মহাবাক্য উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন, যা হলো— 'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।'

আর্য ঋষিদেব স্বাধীন তন্নিষ্ঠ চিন্তাধারার সর্বপ্রথম সোচ্চার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় বেদ, বেদাঙ্গ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির মধ্যে। আত্মিক উৎক্রমণ তত্ত্বের পাশাপাশি প্রকৃতি, বস্তুজগৎ ও তার রহস্য উন্মোচনের নিরলস প্রয়াসের মধ্য থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছিল গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, ভেষজবিজ্ঞান, ভূগোল ও খগোল বিদ্যা, পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান। তৎসহ তাদের ফলিত দিকগুলির বীজ যা পরে সনাতন ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে পল্লবিত হয়ে মহীরূহে পরিণত হয়।

১৮৩৫ সালে থমাস ব্যাবিংটন মেকলে ভারতের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কারের ছলে অর্বাচীন ইউরোপীয় ভাবধারামূলক শিক্ষার প্রসার করতে গিয়ে যে অপযুক্তি দেন, তাকেই আমরা শিরোধার্য করে নিজেদের প্রাচীন উৎকর্ষতা ভুলে হারিয়ে ফেলছি ঋষি-বিজ্ঞানীদের আয়ত্তকৃত ফলিত বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি। যে সময় ইউরোপ ও অন্যান্য জাতি উলঙ্গ অবস্থায় বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো সেই সময় সনাতন ভারতবর্ষ তার নিরলস প্রয়াসে জ্ঞান গরিমার শীর্ষারোহণ করেছিল ধীরে ধীরে।

বৈদিক ঋষি তথা বৈজ্ঞানিকরা জানতেন, যে কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা বিদ্যার মূলভিত্তি হচ্ছে গণিত। পাটিগণিত বা জ্যামিতি ছিল সম্পূর্ণরূপে সনাতনী ঋষিদের উদ্ভাবিত। যজ্ঞবেদির বিভিন্ন মাপের হিসেব থেকেই বৈদিক কল্পসূত্রের অন্তর্গত রেখাগণিত বা জ্যামিতির উদ্ভাবন। ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা, তৎসহযোগে '০'-র আবিষ্কার হিন্দুদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ও প্রত্যক্ষ বিশেষ জ্ঞান! গণিতে 'অসীম' বা আলফার প্রকাশ ঘটেছে ভারতের সনাতনী বৈদিক ঋষিদের হাত ধরে। ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন তাঁর 'ভারত-ইতিহাস' গ্রন্থে একথা উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ সনাতনী ঋষিরা পাটিগণিতে যে অবিসংবাদিত রূপে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন গ্রিকদের তুলনায়, তা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না।

পাশ্চাত্য দেশগুলি খুব ভালো করেই জানে যে ভারত থেকেই এই পদ্ধতি আরব বণিকদের মাধ্যমে গ্রিস তথা ইউরোপে পৌঁছায়। নিজেদের হীনম্মন্যতা ঢাকার জন্যই পাশ্চাত্য স্কলারদের চেষ্টা করতে হয়েছে যে ভারতের আবিষ্কৃত সংখ্যাগুলি আরবদের সংখ্যা বলে প্রচার করার! অক্ষর আবিষ্কারের পরই মানুষের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হলো সংখ্যার আবিষ্কার! রোমান বা গ্রিকরা যেখানে ১০০০ (মিলি) ও ১০০০০ (মিরিয়াড) পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে পারতো, ভারতীয়রা তারও আগে থেকে এই মিরিয়াড বা অযুতের পরে নিযুত, প্রযুত, অর্বুদ, ন্যর্বুদ, সমুদ্র, মধ্য, অন্ত, পরার্ধ, অনন্তর মতো সংখ্যা, যেগুলির প্রতিটি উত্তরোত্তর দশগুণ, সেগুলির আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। 'বাজসেনীয়',

‘তৈত্তরীয় সংহিতা’ ও ‘শ্রৌত সূত্রে’-এর উল্লেখ রয়েছে।

নিখুঁত বর্গ নয় এমন সংখ্যার বর্গমূল, এমনকী বৈদিক ভারতের অবিদিত ছিল না কেমন করে পূর্ণসংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গ, ঘন ও ঘনমূল নির্ণয় করতে হয়! যে সময়, পাশ্চাত্য দেশগুলি ভাগ করার পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞান ছিল; সেই সময় ভারতীয় ঋষিরা তাঁদের অবদান রেখেছিলেন ভাগ করার প্রণালী আবিষ্কারের মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, ত্রৈরাশিক, ভগ্নাংশ, ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ করতে যে ল.সা.গু (লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক) বার করতে হয়; তা; সনাতনী গণিতজ্ঞ আর্যভট্টের ‘মহাসিদ্ধান্ত’ ছন্দ গণিত বা Permutation & Combination-এর রূপরেখা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করেন। ‘শতপথ ব্রাহ্মণ’ ও আর্যভট্টের গ্রন্থ থেকে সমান্তর ও গুণোত্তর প্রগতি (Arithmetical & Geometrical progression) নিয়ম পাওয়া যায়। ভাস্করাচার্যের ‘সিদ্ধান্ত শিরোমণি’-র পাটিগণিত অংশের নাম ‘লীলাবতী’। যেখানে কোনো সংখ্যাকে ‘০’ দিয়ে ভাগ করলে যে অনন্তরাশি বা ইনফিনিটি পাওয়া যায় তার উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগে পাটিগণিতকে বলা হতো ব্যক্ত গণিত এবং বীজগণিতের নাম ছিল অব্যক্ত-গণিত। অব্যক্ত গণিত অর্থাৎ অজাত রাশির গণনা বিজ্ঞান ও বীজ অর্থে মূল বা কারণ। ইংরেজি ‘অ্যালজেবরা’ শব্দটি এসেছে আরবীয় গণিতজ্ঞ মহম্মদ মুশা আল খোয়ারেজমি (৮২৫ খ্রি:)-র ‘আলজেব-ওয়াল-মোকাবেলা’ নামক বীজগণিত গ্রন্থ থেকে। ইনি ভারতীয় পণ্ডিতদের থেকে অব্যক্ত গণিতশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন এবং ইউরোপ এই জ্ঞান লাভ করে আরবীয়দের কাছ থেকে। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের বোডেন অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়ামস্-এর সোজাসাপটা কথায় পাওয়া যায় যে, আরবরা হিন্দুদের কাছ থেকে কেবল যে বীজগণিতের মূল সূত্রটাই পেয়েছিল তা নয়, তারা গণনা সংখ্যাগুলি ও দশ ধরে গণনার পদ্ধতিও হিন্দুদের কাছ থেকে পায়! মনে রাখতে হবে, মনিয়ার উইলিয়ামসের ভারত- বন্ধু বলে খুব একটা খ্যাতি না থাকলেও, অন্ধ ধর্মান্তকরণের প্রবক্তা হিসেবে তাঁর অখ্যাতি ছিল না!

বৈদিক ঋষিরাই প্রথম জগৎকে ঋণাত্মক সংখ্যার ধারণা দান করেন। বৈদিক যুগে ধন বা পজেটিভ সংখ্যাকে ঋক্ ও ঋণ বা নেগেটিভ সংখ্যাকে ‘অনৃক’ বলা হতো। ব্রহ্মগুপ্তই প্রথমে চালু করেন ঋকের পরিবর্তে ধন ও অনৃকের পরিবর্তে ঋণ শব্দদুটি। বীজগণিতের সমীকরণ শব্দটিও ব্রহ্মগুপ্তের (৬২৮ খ্রি:) অবদান। দশম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ শ্রীধর আবিষ্কার করেন হিন্দু গণিতের চার রকম সমীকরণ যেমন—

(১) এক বর্ণ সমীকরণ (simple equation);

(২) অনেক বর্ণ সমীকরণ (simultaneous equation)

(৩) মধ্যমাহরণ (quadratic equadratic equation)

(৪) ভাবিত (equation involving products of two unknown quantities).

‘গণিতসার’ বা ত্রিশতিকায় আচার্য শ্রীধর বর্ণনা করেছেন শূন্যের তাৎপর্য। শুধু তাই নয়, দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান সূত্র তাঁরই আবিষ্কার।

আসলে আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর, পদ্মনাভ, ভাস্করাচার্য প্রমুখ ওই প্রাচীনকালেই যা যা আবিষ্কার করেছেন, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেগুলিই পশ্চিমি দেশগুলো পুনরাবিষ্কার করে নিজেদের আবিষ্কারক বলে প্রচার করে চলেছে। বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদীর গঠন প্রণালী স্থির করতে গিয়ে উৎপত্তি হয় জ্যামিতির। জ্যা-অর্থ ভূমি এবং মিতি-অর্থ পরিমাপ। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র দত্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে গেছেন— ‘জগৎ জ্যামিতির প্রথম শিক্ষার জন্য ভারতের কাছেই ঋণী। গ্রিসের কাছে নয়।’ বৌধায়ন ও আপস্তম্ভের ‘শূল্বসূত্র’-এ জ্যামিতির এমন সব উপপাদ্য প্রমাণ করা হয়েছে পরবর্তীতে পিথাগোরাস নাকি পুনরায় সেসব আবিষ্কার করেন। পিথাগোরাসের জন্মেরও বহু আগে থেকে ‘শূল্বসূত্র’ হিন্দুদের ধর্মীয় কাজে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে সনাতন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। এই ‘শূল্বসূত্র’ খ্রি:পূ: অষ্টম শতাব্দীর গ্রন্থ। আর্যভট্টই প্রথম পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত অর্থাৎ ‘পাই’-এর মান যে ২২/৭ সেকথা বলেন। পৃথিবী যে গোল সেকথা দশম শতাব্দীর গণিতবিদ ‘লল্লাচার্য’ প্রথম পৃথিবীকে জানান এবং পৃথিবীর আবর্তনের জন্যই যে দিবারাত্র হয়ে থাকে তা ওই দশম শতাব্দীতেই ‘মহাসিদ্ধান্ত’ বা ‘আর্যসিদ্ধান্ত’ গ্রন্থে আর্যভট্ট লিখেছিলেন—

‘ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেব বৃত্যাবৃত্য’

অর্থাৎ নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডল স্থির হলেও স্বীয় মেরুদণ্ড অবলম্বন পূর্বক ভ্রমণ করে। সেজন্যই গ্রহ নক্ষত্রের উদয় ও অস্ত ঘটে। ভাস্করাচার্য তাঁর ‘সিদ্ধান্ত শিরোমণি’ গ্রন্থে লল্লাচার্য ও আর্যভট্টকে সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন—

‘‘যদি সমা মুকুরোদর সন্নিভা
ভগবতী ধরণী তরণিঃ ক্ষিতেঃ।
উপরি দূরগতহপি পরিভ্রমণ্
কিমু নরৈ রমরৈরিব নেক্ষত্যে।।’’

অর্থাৎ পৃথিবী যদি আয়নার মতো সমতল হতো, তবে যে সূর্য বহু উপরে ও দূরে থেকে অবস্থান করছে তাকে দেবতারা যেমন সর্বদা দেখতে পায়, মানুষেও তেমন পায় না কেন? ভাস্করাচার্যের অনুপম উপমা বুঝিয়ে দেয় গোলাকার হওয়া সত্ত্বেও কেন পৃথিবীর পৃষ্ঠ সমতল দেখায়। তিনি বলেছেন—

‘‘সমো যতঃ স্যাৎপরিধেঃ শতাংশ
পৃথ্বীচ পৃথ্বী নিতরাং তনীয়ান্।
নরশ্চ তৎপৃষ্ঠগতস্য কৃৎস্না
সমেব তস্য প্রতিভাত্যতঃ সা।।’’

অর্থাৎ একটি বৃত্তের পরিধির শতভাগের এক ভাগকে যেমন সমান বোধ হয়, তেমনি মানুষ পৃথিবীর পৃষ্ঠে থেকে পৃথিবীর খুব সামান্য অংশ দেখতে পায় বলে তাকে সমতল দেখায়। আর্যভট্টের একটি সিদ্ধান্ত— ‘বৃত্তভপঞ্জোর মধ্যে কক্ষয়া পরিবেষ্টিতঃ’-এর সমর্থনে ভাস্করাচার্য তাঁর

সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে বলেছেন— 'নান্যাধার স্বশক্তৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতী হাস্য পৃষ্ঠে' অর্থাৎ পৃথিবীর কোনো আধার নেই নিয়ত অন্তরীক্ষে অবস্থান করে। আমরা তার পৃষ্ঠদেশে বাস করছি। কোপারনিকাসের হাজার বছর আগে জন্ম নেওয়া আর্যভট্ট প্রমাণ করে দিয়েছিলেন পৃথিবীর আবর্তন তত্ত্ব। ভাস্করাচার্য তাঁর গোলাধ্যায়ের ভাষ্যে লেখেন যে বৈদিক ঋষিরা জানতেন যে পৃথিবী গোলাকার কারণ বেদের গোলাধ্যায়ে তাঁরা পরিষ্কার জানিয়েছেন যে 'কপিত্থ ফলবৎ বিশ্বম্'।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় গণিতজ্ঞ 'CLOVIUS'-র দ্বারা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বার করার প্রণালীর বহু আগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে লেখা অর্থাৎ ৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে লেখা আর্যভট্টের 'সূর্য সিদ্ধান্ত' বরাহমিহিরের এবং (৫০৫-৫৮৭ খ্রি:) 'পঞ্চসিদ্ধান্তকায়'-এর উল্লেখ রয়েছে।

ত্রিকোণমিতির উন্মেষ যে ভারতেই হয়েছিল তা যতই হিপারকাশ-কে (১৯০-১২০ খ্রি:পূ:) ত্রিকোণমিতির জনক হিসেবে দেখানো হোক না কেন। 'সূর্য সিদ্ধান্ত' লেখার বহু আগেই ভারতে ত্রিকোণমিতির চল ছিল, কারণ 'সূর্য সিদ্ধান্তে' ত্রিকোণমিতির এমন সব সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি আছে যা প্রমাণ করে ভারতবর্ষে ত্রিকোণমিতির চর্চা বহু আগে শুরু হয়েছে। বিদগ্ধ গণিতজ্ঞরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, কোনো পুস্তক যত প্রাচীন হোক না কেন সেখানে যদি ত্রিকোণমিতি পাওয়া যায়; তবে ওই গ্রন্থ যে বিজ্ঞানের শৈশব অবস্থায় লেখা হতে পারে না একথা মেনে নিতেই হবে! বর্তমানের Sin 0, Cos 0, Sin^{-1} 0 এসব ভারতীয় ঋষিদেরই অবদান যা তৎকালে জ্যা, কোটি জ্যা, উৎক্রম জ্যা নামে পরিগণিত হতো।

বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও তৎসহ প্রাচীন গ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে, সনাতন ভারতে পাটিগণিত, বীজগণিত, স্থিতিগণিত, গতিগণিত, বলগণিত, জলগণিত, ভূমিতি, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, দ্বিপদাভু, ঘাতাঙ্ক চক্রতত্ত্ব, ভগন তত্ত্ব, ভূগোল তত্ত্ব, খগোল তত্ত্ব, বর্গাঙ্ক, যুগপদাঙ্ক, ব্যাসকলন বা চলগণিত সমাকলন, শঙ্কুচ্ছেদ প্রভৃতি গণিতের সর্ব বিভাগের চর্চাই পুরোদমে হয়েছে। যে ক্যালকুলাস নিউটনের আবিষ্কার বলা হয় তা নিউটন বা লিবনিজের অন্তত ৫০০ বছরেরও আগে ভাস্করাচার্য, 'লঘুমানস' প্রণেতা মুঞ্জাল বা 'মহাসিদ্ধান্ত' প্রণেতা 'আর্যভট্টের' অজানা ছিল না।

জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চাও সনাতন ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকে শুরু হয়েছিল। এক পূর্ণচন্দ্র অর্থাৎ পূর্ণিমা থেকে আরেক পূর্ণিমা এবং চন্দ্রহীন রাত অর্থাৎ অমাবস্যা পর্যন্ত যে ত্রিশবার সূর্যোদয় হয়, তা খেয়াল করে তাঁরা ত্রিশ দিনে মাস এবং একটি নক্ষত্র থেকে শুরু করলে সূর্য যে আবার ৩৬৫ দিনে ওই নক্ষত্রেই ফিরে আসে অর্থাৎ এক বছর হয় তাও তাঁরা জানতেন। এমনকী, বারো চান্দ্রমাসে যে ৩৬৫ দিন পূর্ণ হয় না, প্রতি তিন বছরে যে প্রায় একমাস কম পড়ে এ মনে রেখেই; চান্দ্র মাস ও সৌর বছরের সামঞ্জস্য রেখে তাঁরা প্রতি তিন বছরে একটি মলমাস ঠিক করে নেন। সনাতনী হিন্দুর সব শুভ কার্যই তিথি অনুসারী বলে চন্দ্রের গতি বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা অত্যন্ত আবশ্যক ছিল! আগেই উল্লেখ হয়েছে 'কপিত্থ ফলবৎ বিশ্বম্'-বেদের গোলাধ্যায়ের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে ভাস্করাচার্য সমর্থন করেছিলেন, এর প্রমাণ রয়েছে বরাহপুরাণে— বরাহ-অবতার রূপী বিষ্ণু গোলকবৎ পৃথিবীকে নিজ দন্ত দ্বারা প্রলয়জলধি থেকে উদ্ধার করছেন।

আজ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল হিসেবে গ্রিনিচকে ধরা হয়। ১৯২৮ সালে আন্তর্জাতিক জ্যোতি শাস্ত্রীয় সংস্থা দ্বারা গ্রিনিচ-কে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল ঠিক করা হয়। কারণ বিশ্বে তখন ব্রিটেন ছিল প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী, যাদের রাজত্বে সূর্য অস্ত যেত না। 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' পরিষ্কার করে বলেছে— 'লঙ্কা কু মধ্যে যমকোটি রম্যাঃ প্রাক পশ্চিমে রোমক পত্তনং চ'। ভাস্করাচার্যের 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' ছাড়াও ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত' গ্রন্থেও অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করা হয়েছে, প্রাচীন ভারত লঙ্কাকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল ধরে সময় নির্ণয় করা হতো! সঙ্গে সঙ্গে ভৌগোলিক বিভিন্ন গণনাও করা হতো। আসলে শুধুমাত্র বিজয়ী দেশের অহংবোধে গ্রিনিচ আজ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে!

পৃথিবীর উপরে কতদূর পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের বিস্তৃতি তা নিয়েও ভাস্করাচার্য বলে গেছেন— 'ভূমের্বাহির্দ্ধাদশ যোজনানি' অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল দ্বাদশ যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের বহু আগে বেদের গোলাধ্যায়ে রয়ে গেছে সেই শ্লোক যেখানে বলা হচ্ছে—

আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহীর্তয়া য্য খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।

অবকৃষত্যে তৎ পততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং মে।।

অর্থাৎ, পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি যখন আকাশে অবস্থিত গুরু বস্তুকে আপন শক্তি দ্বারা নিজ দিকে আকর্ষণ করে, তখন মনে হয় ওই সকল বস্তু নিজে থেকে পৃথিবীর উপর পড়ছে, কিন্তু বাস্তবিক তারা পড়ছে না, পৃথিবীর দ্বারা আকর্ষিত হচ্ছে। ওই যে 'সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং মে'— সকল দিকে সমান আকর্ষণে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় পৃথিবী আকাশে কোথায় গিয়ে পড়বে?

বৈশেষিক সূত্র প্রণেতা মহাঋষি 'কণাদ' বিশ্বে প্রথম পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণার কথা চিন্তা করেন। ২৬০০ বছর আগে পারমাণবিক গঠন, পারমাণবিক তত্ত্ব এবং গতির সূত্র কণাদের মাধ্যমেই বিশ্ব জ্ঞাত হয়। 'অগস্ত্য সংহিতা' অনুযায়ী প্রাচীন ভারতে বৈদ্যুতিক ব্যাটারি কীভাবে তৈরি হতো তা জানা যায়। ঋষি অগস্ত্য মাটির পাত্রে তামার পাত, শিখিগ্রীব অর্থাৎ কপার সালফেট, ভেজা কাঠের গুঁড়ো, দস্তা (জিঙ্ক) ও পারদ ব্যবহার করে কীভাবে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায় তা দেখিয়েছিলেন, যে কারণে তাঁর উপাধি হয়েছিল 'কুম্ভোদ্ভব'। ১২০০-১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেই প্রাচীন ভারত ঋষি অগস্ত্যর হাত ধরে বৈদ্যুতিক কোষ ব্যবহার পদ্ধতি জেনে গিয়েছিল।

শুধু গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, ভূগোল, খগোল বা পদার্থ বিজ্ঞানই নয়, প্রাচীন ভারত পথ দেখিয়েছিল চিকিৎসা

ভেষজ, রসায়ন বিজ্ঞানকেও। ঋগ্বেদে উল্লেখ রয়েছে চিকিৎসকদের কথা। অথর্ববেদের বিভিন্ন স্তোত্রে শারীরবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। অথর্ববেদের ঋষিরা শারীরবিদ্যা অর্থাৎ অ্যানাটমিকে কতটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যা শরীরের প্রতিটি অংশের প্রতিটা অস্থির নামকরণ থেকে বোঝা যায়! এটাই শেষ কথা নয়, যা পরে আত্রেয়, চরক, সুশ্রুত প্রমুখ চিকিৎসাবিজ্ঞানীর উল্লিখিত অস্থি সংস্থানের সঙ্গে মিলে যায় এবং অনেক পরে পাশ্চাত্যের চিকিৎসকদের বর্তমান বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়! অথর্ববেদে শল্যবিদ্যা, নানা সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসা, স্ত্রীরোগ বিদ্যা, গবাদি পশুর রোগের উল্লেখই শুধু নয়, প্রতিকারের পদ্ধতি ও ওযুধের কথাও বলা হয়েছে।

রামায়ণ, মহাভারত থেকেও প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি ও ওযুধ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। প্রাচীন সনাতন ভারতে যে অশ্ব ও হস্তি চিকিৎসা সুবিদিত ছিল তার প্রমাণ ২০০০ শ্লোক এবং আট অধ্যায় সমন্বিত ‘শালিহোত্র সংহিতা, যার অপর নাম ‘অশ্বায়ুর্বেদ সিদ্ধান্ত’ নামক গ্রন্থ; এবং ‘পালকাপ্যের- হস্ত্যয়ুর্বেদ। হস্তি চিকিৎসার প্রাচীনতম গ্রন্থ যা চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। সনাতন ভারতে প্রাণীবিদ্যার উপর আরও একটি প্রাচীন গ্রন্থ প্রাণীতত্ত্ববিদ ‘নীলকণ্ঠের’ রচিত মাতঙ্গলীলা’। প্রাচীন হিন্দু ভিষগাচার্যরা যে ‘ম্যালেরিয়া’-রোগ এবং তার কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞান ছিলেন না তার প্রমাণ পাওয়া যায় অথর্ববেদ। সেখানে ‘তক্মন’ বলে ম্যালেরিয়ার সমগোত্রীয় একটি জ্বরের উল্লেখ আছে! অথর্ববেদের পাঁচটি পরিশিষ্টের মধ্যে ‘কোশিক সূত্র’ বা ‘কৌশিক গৃহ্যসূত্রে’ প্রচুর ভেষজ উদ্ভিদের নাম পাওয়া যায়, যার মধ্যে ত্রিকটু যা তিনটি ভেষজ— আদা, লঙ্কা ও গোলমরিচের মিশ্রণ। উত্তর পশ্চিম হিমালয়ের কুটাকি, ঘৃতকুমারী, বাসক, তুলসী, নিম, আদা, অর্জুন, দুর্বা, হরিদ্রা, তিল, পিপুল, লাউ, হরিতকী, আমলকি প্রভৃতি অথর্ববেদের ভেষজ তালিকায় স্থান পেয়েছে।

আসলে অথর্ববেদের মধ্যে শারীরবৃত্ত অংশটির বিস্তৃত আলোচনাই হলো আয়ুর্বেদের ভিত্তি বা অথর্ববেদের সম্প্রসারিত শাখাটিই আসলে আয়ুর্বেদ। অথর্ববেদ ঋগ্বেদের পরে হলেও, এবিষয়ে ঋগ্বেদও খুব পিছিয়ে নেই। ঋগ্বেদে চিকিৎসক হিসেবে দক্ষ, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, ভৃগু, ধন্বন্তরি প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। আত্রেয়, চরক ও সুশ্রুতকে মনে করা হয় ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক। কারণ এর আগের ইতিহাস অধিকাংশটাই হারিয়ে গিয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে আত্রেয় ও সুশ্রুতের উল্লেখ পাওয়া যায়। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পাঁচ খণ্ডে রচিত ‘আত্রেয় সংহিতার’ লেখক ঋষি আত্রেয় ছিলেন মূলত ‘কায়তন্ত্রী’ বা ‘জেনারেল মেডিসিনে’র লোক। ভরদ্বাজ শিষ্য আত্রেয় ঋষির রচিত ‘আত্রেয় সংহিতা’-র অবলম্বনে তাঁর শিষ্য দৃঢ়বল রচনা করেন ‘চরক সংহিতা’ যা কায়তন্ত্রী চিকিৎসা-র এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই পুরো কায়তান্ত্রিক চিকিৎসা পদ্ধতি যা ভরদ্বাজ থেকে দৃঢ়বল পর্যন্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রাচীনকালে পরিপুষ্ট হয়েছিল তা ‘ভেল’ও ‘হারিত সংহিতাতে’ও সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হয়েছে। এই বৈদিক যুগে কাশীরাজ দিবোদাস বা ধন্বন্তরির নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন কবি বিশ্বমিত্রের পুত্র সুশ্রুত। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এই সুশ্রুত ছিলেন মূলত শল্যচিকিৎসক। সুশ্রুতের পর খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৬ থেকে ৪৮৬ অব্দে পাওয়া যায় মগধরাজ বিম্বিসারের স্বনামধন্য কিংবদন্তী চিকিৎসক জীবক বা জীবক কোমারভচ্চকে। শল্যচিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা ও সাধারণ চিকিৎসা তিনটি বিভাগেই তিনি পারদর্শিতা লাভ করেন। ভগবান বুদ্ধেরও তিনি ছিলেন চিকিৎসক। ৯টি অধ্যায়ে রচিত ‘কাশ্যপ সংহিতা’ নামে জীবকের রচিত গ্রন্থ সেই যুগে শুধু নয়, তার পরবর্তী যুগেও ভারতীয় চিকিৎসকেরা অনুসরণ করে গেছেন; সেকথা অস্বীকার করা যায় না! তাই, হিপোক্রেটিসকে চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক বলা হলেও, তাঁর ওযুধ প্রয়োগ ও তার ব্যবহার যে তিনি আয়ুর্বেদের কাছ থেকেই পান তা পরোক্ষভাবে হলেও ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথিতযশা অধ্যাপক ডাঃ টমাস ওয়াইজ তাঁর ‘দ্য হিস্টরি অফ মেডিসিন’ গ্রন্থে স্বীকার করে গেছেন। তিনি লিখেছেন যে, ‘হিন্দুদের কাছ থেকেই আমরা প্রথম চিকিৎসা প্রণালী পেয়েছি।’

আয়ুর্বেদের প্রলম্বিত অংশ থেকেই উদ্ভব হয় রসায়ণের। বহু শতাব্দী আগে সনাতনী চিকিৎসা পদ্ধতি বা আয়ুর্বেদের সঙ্গে সঙ্গে রসায়নের চর্চা ভারতীয় ভিষগাচার্যরা শুরু করেছিলেন যখন পাশ্চাত্যে চিকিৎসাবিদ্যা ছিল শৈশবস্থায়! অথর্ববেদের উপাঙ্গ এই আয়ুর্বেদ যা সুশ্রুতের মতে ছিল সহস্র অধ্যায় ও লক্ষাধিক শ্লোকে বিস্তৃত। জীবনের সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য অথর্ববেদের যে শব্দটির সমার্থক তা হলো আয়ষ্যানি, আর এই আয়ষ্যাণি থেকেই রসায়নের সূত্রপাত। সংস্কৃত ভাষায় ‘পারদের’ বা ‘মার্কারির’ আরও এক নাম ‘রস’। পারদের সংযুক্তি যে তন্ত্রের অন্তর্গত তাই হলো ‘রসায়নতন্ত্র।’

নাগার্জুন, বাগভট্ট, মাধবকর, বৃন্দ, চক্রপাণি দত্ত, শার্ঙ্গধর প্রমুখ চিকিৎসাবিদরা একদিকে যেমন চিকিৎসা করতেন, অন্যদিকে তেমনি রসায়ন চর্চাতেও তাঁদের মস্তিষ্ক ক্ষান্তিলাভ করেনি। এছাড়া প্রাচীনকালে মৃৎশিল্পও সনাতন ভারতে রসায়নচর্চার পথ খুলে দিয়েছিল। সেই প্রাচীনকালেই ভারতীয়রা সুতোকে পাকা নীল ও লাল রঙে রঞ্জিত করতে নীল ও মঞ্জিষ্ঠা ব্যবহার করত। যা থেকে বোঝা যায় রসায়ন ও ফলিত রসায়নে ভারতবর্ষ প্রভূত উন্নতি করেছিল। বৈদিক যুগে সোনার অলঙ্কার ধারণ বা স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার ঘোষিত করে আকরিক থেকে সোনা নিষ্কাশনের পদ্ধতি ভারতেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়। লোহা বা তামাও যে প্রণালীতে সেই সময় ভারতবর্ষে নিষ্কাশিত হতো তা থেকে বোঝা যায় মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের জ্ঞানও তাঁদের করায়ত্ত ছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদেই শুধু নয়, চরক ও সুশ্রুত সংহিতাতেও সোনা, রুপা, লোহা, টিন, সিসা, তামা প্রভৃতি ধাতুর উল্লেখ পাওয়া যায়। *(ক্রমশ)*

বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর হিন্দু জাতীয়তার প্রখর প্রবক্তা

ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি

বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর ছিলেন প্রখর দেশপ্রেমিক এবং দূরদর্শী চিন্তাবিদ। কংগ্রেস বা বামপন্থীরা সুযোগ পেলেই তাঁর সম্পর্কে নানা ভাবে অপপ্রচার করে থাকে। দেশে বিলুপ্তপ্রায় বামেরা কবেই-বা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং তার রক্ষাকর্তাদের সম্মান জানিয়েছেন? তারা মহারাণা প্রতাপ বা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের অতুলনীয় শৌর্য লেনিন বা চে-গেভারা ঢক্কানিনাদে মুছে ফেলতে চেয়েছেন। তাদের দৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু চূড়ান্ত উপেক্ষিত। গান্ধীজীর সঙ্গে সাভারকরের নানা বিষয়ে মতবিরোধ কংগ্রেসকে সাভারকর বিমুখ হতে প্ররোচিত করে। বীর সাভারকরের যথার্থ বিপ্লবী চরিত্র, বাস্তবতাবোধ, সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আপোশহীন মনোভাব গান্ধী-নেহরু ও কমিউনিস্টরা সহ্য করতে পারেননি।

বিনায়ক সাভারকর শুধু বিপ্লবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন জাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ। বিজাতীয় বামেরা তাঁকে হিন্দুত্ববাদী, সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি বলে দাগিয়ে দিতে চায়। যদিও এই সব তাত্ত্বিক বামনেতারা কেউই তাঁর মতো কুড়ি বছরের বেশি টানা কারাবাসের যন্ত্রণা ভোগ করেননি। পূর্বপাকিস্তান থেকে ইসলামি পদাঘাতকে 'দেহি পদপল্লব মুদারম্' মনে করা এইসব দিব্যজ্ঞানী বামেরা সাভারকরকে ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ বলে হিন্দু অধ্যুষিত ভারতে বসে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

সাভারকর হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কী ভাবতেন? তিনি হিন্দুত্ব ও হিন্দুইজম্‌কে পৃথক বলে মনে করতেন। 'হিন্দুইজম্' শব্দটি হলো ব্রিটিশ শাসকদের সৃষ্টি। মনিয়ের উইলিয়ামস্ হলেন এই শব্দটির প্রণেতা। এর সঙ্গে 'হিন্দুত্ব'-এর কোনো সম্পর্ক নেই। যদিও অনেকে মনে করে থাকেন যে, 'হিন্দুইজম্' শব্দের অর্থটি মূলত হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত। এর সঙ্গে নানা রিচুয়াল থাকে। অন্যদিকে 'হিন্দুত্ব' হলো সাভারকরের কাছে বিপুল এক প্রবহমান শক্তিময় ক্রিয়াকলাপ; হিন্দুদের সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক, রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনা এর অন্তর্ভুক্ত। 'হিন্দুত্ব' হলো সেই বিষয় বা জীবনদর্শন যা লৌকিক ও পারমার্থিক ভাবনার সঙ্গে যোগসূত্র রাখে। বীর সাভারকরের এই ভাবনা স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে। ভারতীয়রা 'হিন্দুত্ব' থেকে বিচ্যুত হচ্ছে বলেই তাদের যাবতীয় ক্লেশ সইতে হয়। স্বামীজী বলেছেন— 'আমাদের জাতি নিজেদের বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে, সেই জন্যই ভারতের এত দুঃখ কষ্ট। সেই জাতীয় বিশেষত্বের যাহাতে বিকাশ হয় তাহাই করিতে হইবে। খাঁটি হিন্দুদেরই এই কার্য করিতে হইবে।'

খাঁটি হিন্দু কখনোই সংকীর্ণ হবেন না। এই সংকীর্ণতা অতীত থেকে বর্তমানে নানা বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। বীর সাভারকর চাইতেন সর্বপ্রকার গোঁড়ামি মুক্ত আধুনিক হিন্দুজাতি।

কারামুক্তির পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে সমাজে ব্যাপক শুদ্ধীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন ভারত জননীর এই মহান সন্তান। মহারাষ্ট্র থেকে শুরু হলো সেই শুদ্ধিপ্রয়াস। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ ভেদ তখন সেখানে প্রবল। শক্তিমান হিন্দুরাষ্ট্র যাঁর কাম্যবস্তু, তিনি সব বর্ণের জন্য একই বিদ্যালয় তৈরি করতে চাইলেন। স্বভাবতই এক্ষেত্রে নানা বিরোধিতা আসে। কিন্তু এই চিৎপাবন ব্রাহ্মণ তাঁর অসাধারণ যুক্তি ও ব্যক্তিত্বের সাহায্যে সবাইকে একই বিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন।

বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে জাতিভেদ তো দূর হলো। এবার ঈশ্বর আরাধনার জন্য সমস্ত বাধা দূর করতে চাইলেন তিনি। দেবালয়ে থাকবে না উচ্চ-নীচ ভেদ। ১৯২৯ সালে রত্নগিরির বিঠোবা মন্দিরে সব শ্রেণীর মানুষের প্রবেশাধিকার নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিটি ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই উপস্থিত। সাভারকরের কুপ্রথা-বিরোধী,

বলিষ্ঠ বক্তব্য সবাইকে অভিভূত করল। সিটি ম্যাজিস্ট্রেট আপ্লুত হয়ে উপস্থিত জনতার কাছে জানতে চান বীর সাভারকরের সঙ্গে সবাই একমত কিনা। সমবেত জনতা ভেদাভেদ ভুলে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মন্দিরে প্রবেশ করলেন।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বলা হয়েছে 'ন হিন্দুঃ পতিত ভবেৎ'— কোনো হিন্দু পতিত নয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যবন শাসনের কালপর্বে অস্পৃশ্যতা দূর করে সমস্ত হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। বীর সাভারকর সমাজ-বিপ্লবী চৈতন্যদেবের আদর্শকে যেন আরও ছড়িয়ে দিতে চাইলেন। ১৯৩১ সালে রত্নগিরিতে তাঁর উদ্যোগে নির্মিত পতিতপাবন মন্দিরের উদ্বোধনে অবহেলিত মানুষদের দিয়ে পূজার্চনা করার ব্যবস্থা করলেন। তিনি জানতেন বিভক্ত হিন্দু সমাজ কখনোই দেশের জন্য হিতকর নয়। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কারণে উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণরা নিম্নবর্ণের সেই পুরোহিতদের মাল্যদান করলেন। 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' বীর সাভারকরের এমন উদ্যোগে অভিভূত হয়ে লেখে— 'রত্নগিরির মন্দিরে এমন সমাজ সংস্কার অসাধারণ। গান্ধী বা অন্য কোনো কংগ্রেসি এমন করতে সম্ভবত পারবেন না, বিস্ময়কর হলো, বীর সাভারকরের ওজস্বী বক্তৃতার পর সংকীর্ণতা যেন মুহূর্তে উবে যায়।'

বৃহত্তর শক্তিশালী হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের জন্য সাভারকরের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা রত্নগিরিতে যে শুদ্ধীকরণ শুরু করেন তাতে বহু অহিন্দু স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানকার মুসলমান ম্যাজিস্ট্রেট এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাভারকর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান শুদ্ধীকরণ যদি সাম্প্রদায়িক হয়, তাহলে মুসলমান বা খ্রিস্টানদের ধর্মান্তরণ শুদ্ধ হয় কী করে? সাভারকর স্পষ্টবাদী। বীর। দ্রষ্টা। তিনি বললেন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মহম্মদ আলি অস্পৃশ্য হিন্দুদের মুসলমান হওয়ার কথা বলেও দিব্যি জাতীয়তাবাদী নেতা হন। অন্যদিকে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বা লালা লাজপত রায় শুদ্ধীকরণের কথা বলে সাম্প্রদায়িক হন! এমন প্রতারণা যে ভারতীয়ত্বের পক্ষে চরম ক্ষতিকর তা জানাতে দ্বিধা করেননি সাভারকর।

আসলে গান্ধী ও তার অনুগামীরা কখনোই হিন্দুজাতিকে শক্তিশালী করা পছন্দ করতেন না। বীর সাভারকরের নেতৃত্বে হায়দরাবাদের নিজামের তীব্র হিন্দু বিদ্বেষের বিরুদ্ধে ১৯৩৮ সালে হিন্দু মহাসভা ও আর্যসমাজের বিক্ষোভ শুরু হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও হিন্দুরা সেখানে মন্দির নির্মাণ, বিদ্যালয় পরিচালনা ইত্যাদির সুযোগ যথাযথ পেতেন না। তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বে হাজার হাজার হিন্দু নিজামের জেলখানা ভরিয়ে দিতে থাকেন। এবারে আসরে নামলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। গান্ধীজী জানালেন, নিজামের বিরোধিতা হচ্ছে বলে রাতে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে। নিজাম সমস্ত প্রজার পিতা, তাই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ উচিত নয়। বীর সাভারকর তীব্রভাবে এই মন্তব্যের বিরোধিতা করেন। কাশ্মীরের মুসলমান প্রজাদের দাবি পূরণ করতে না পারলে কাশ্মীরের হিন্দু রাজাকে গান্ধীজী কাশীবাসের পরামর্শ দিয়েছিলেন। সাভারকর প্রশ্ন তুললেন অহিংসার পূজারি হিন্দু প্রজাদের ওপর ভয়াবহ অত্যাচার করা জেহাদি নিজামকে গান্ধীজী কেন মক্কা বাসের পরামর্শ দিচ্ছেন না? সাভারকরের তীব্র আন্দোলনের ফলে নিজাম ব্যাপক শাসন সংস্কার করে। এর আগে হায়দরাবাদের আইন সভায় কোনো অহিন্দু সদস্য ছিল না। এবার হিন্দুদের জন্য পঞ্চাশ শতাংশ আসন সংরক্ষিত হয়।

বীর সাভারকর গান্ধী বা তাঁর মতবাদের তীব্র সমালোচক ছিলেন বলে কংগ্রেস সবসময় সাভারকরের বিরোধিতা করেছে। সাভারকর কখনোই সংকীর্ণ ছিলেন না। ছিলেন চরম বাস্তববাদী। তিনি জানতেন যে, জাতীয়তা যা মূলত হিন্দু জাতীয়তাবোধ, তা শক্তিশালী না হলে দেশ দুর্বল হবে। শ্রীঅরবিন্দ তখন বলেছিলেন আধ্যাত্মিক জাতীয়তার কথা। আর সেক্ষেত্রে হিন্দুরাই যে বড়ো ভূমিকা নেবেন তাও স্পষ্ট করেছিলেন। ১৯৩৮ সালের ১৫ এপ্রিল বোম্বাইয়ের মারাঠি সাহিত্য সম্মেলনে বীর সাভারকর এক অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। হিটলার অস্ট্রিয়া অধিকার করেন, সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করে তিনি বলেন— 'আপনারা কি অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্টের যন্ত্রণার কথা শোনেননি? প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন আমরা জার্মান সনেট নয়, তাদের বেয়নেটের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছি।' বীর সাভারকর বলেন জাতি যখন বিপন্ন হয় তখন নিছক সৌন্দর্য ভরা সাহিত্যের চর্চা করে লাভ কী? তিনি সেদিন বলেছিলেন হিন্দুস্থানে যে বর্বর ধ্বংসলীলা চলেছিল, তা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের শৌর্যের কাছে প্রতিহত হয়েছিল। তাঁর স্পষ্ট কথা— কোনো পরাধীন দেশে সাহিত্যের অগ্রগতি সম্ভব নয়।

সমস্ত সংকীর্ণতা থেকে দূরে থাকা বীর সাভারকর ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে নাগপুরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে হিন্দু জাতীয়তাকে স্পষ্ট পথনির্দেশ দিলেন। তাঁর কথা হিন্দুস্থানে হিন্দুরাই একমাত্র জাতীয় পদবাচ্য। তাঁর কথায় 'হিন্দু' বলে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মমত নেই। হিন্দু হলো জাতিবাচক শব্দ। বেদ মান্যতাকারী, বেদ বিরোধী, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, জনজাতি, উপজাতিরা সবাই হিন্দু। এঁদের জীবন চালিত হয় হিন্দুত্ব দিয়ে।

ভারতের সর্বোচ্চ আদালত ১৯৯৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর এক ঐতিহাসিক রায়ে বলে যে, 'হিন্দুত্ব' শব্দের কোনো সংকীর্ণ অর্থ নেই। হিন্দুত্ব কোনো সাম্প্রদায়িক বিষয় নয়। সুপ্রিম কোর্টের মতে, 'হিন্দুত্ব' হলো একটি জীবনপদ্ধতি বা জীবনচর্যা।

এর অনেক আগে অসাধারণ পণ্ডিত বীর সাভারকর বলেন যে, ইংল্যান্ডে ইংরেজ, জার্মানিতে জার্মানরা যেমন জাতি, হিন্দুস্থানে হিন্দুরাও তেমন ন্যাশনাল বা জাতিপদবাচ্য।

বীর সাভারকর ভারতীয় বৈপ্লবিক মতাদর্শের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। সে

সেলুলার জেল

বিপ্লব যেমন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, তেমনই তা সামাজিক ক্ষেত্রেও অতীব উজ্জ্বল। তিনিই প্রথম 'হিন্দুত্ব' ও হিন্দু নেশনের সংজ্ঞা যথাযথভাবে দিয়েছেন। 'হিন্দুত্ব' মূলত রাষ্ট্রীয়তা সম্পর্কিত। ভারতীয় ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করা জাতির জাতিসত্তার পরিচিতি হলো— 'হিন্দুজাতি'। যে জাতি 'ভারতবর্ষ'কে মাতৃজ্ঞানে পূজা করে, তারা হলো 'হিন্দু'। বিদেশিদের তৈরি শব্দ হিন্দুইজম্-এর অর্থ হিন্দুত্ব নয়। হিন্দুইজম্-এর দ্বারা হিন্দুদের ব্যক্তিগত ধর্মাচরণ অনুশীলন কিছুটা ব্যাখ্যা করা যায়। অন্যদিকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে হিন্দুরা এক সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভাষা, দেশ ইত্যাদিতে আবদ্ধ।

বিনায়ক দামোদর সাভারকর এমন এক সর্বসমাবেশকে ভাবনার হিন্দু সমাজের কথা ভাবেন যেখানে জাতীয়তাবোধ যেমন সক্রিয় থাকবে, তেমনই সংকীর্ণতামুক্ত এক ধর্মবোধ সদা জাগ্রত থাকবে। ফলে ধর্মান্তরণ বোধ করা যাবে। তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্মান্তরণ জাতীয়তাবোধের পরিবর্তন ঘটায়। অখণ্ড, শক্তিমান একরাষ্ট্র গড়তে হলে অস্পৃশ্যতা শূন্য, বাস্তববাদী ও শক্তিমান দেহ-মনের মানুষ দরকার। সনাতনী ঐতিহ্য বহন করা সেই হিন্দু সমাজ অতীতে মহারাণা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ, গুরু গোবিন্দ সিংহের মতো শক্তিমান মনোভাবকে নিয়েই বিজাতীয় কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। অস্পৃশ্যতামুক্ত হিন্দু সমাজ হলো যথার্থ ভারতীয়ত্ব। সনাতন রীতি ও সংস্কৃতির এক চলমান শক্তিশালী প্রবাহ। ধর্ম, জাতিসত্তা ও রাষ্ট্ররক্ষায় বীর সাভারকর প্রণীত নীতি ছিল— 'দেশীয় রাজনীতিতে হিন্দুত্বের চেতনায় ক্রমবিকাশ, হিন্দু জাতির সামরিকীকরণ এবং সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ'।

বীর সাভারকর ছিলেন দূরদর্শী, বাস্তববাদী। গান্ধীজীর মুসলমান তোষণ যে, হিন্দুধর্ম ও ভারতের ভয়াবহ ক্ষতি করবে সে বিষয়ে দেশবাসীকে তিনি বার বার সতর্ক করেছিলেন। তিনি সমুন্নত এক হিন্দুত্ব চাইতেন, যে 'হিন্দুত্ব' সমস্ত সংকীর্ণতা ভুলে সমগ্র হিন্দু সমাজকে এক শক্তিমান জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এই উন্নত মনোভাব ভাষা গঠনেও সক্রিয় থেকেছে। হিন্দিতে রয়েছে বহু আরবি, ফার্সি শব্দ। তাঁর জাগ্রত হিন্দু সত্তা মনে করে— ভাষার ক্ষেত্রেও শুদ্ধীকরণ প্রয়োজন। আরবি-ফার্সির অতিরিক্ত ব্যবহারের পরিবর্তে তৎসম শব্দ ব্যবহার করে জাতীয় অস্মিতাকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন। যে জাতিভেদ প্রথা, পরাধীনতা আমাদের দমিয়ে রেখেছিল তার বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর আমৃত্যু সংগ্রাম। তাঁর স্পষ্ট অভিমত ছিল— প্রয়োজনে এক জন বর্ণ হিন্দু ঝাড়ুদার হলেও ক্ষতি নেই। অব্রাহ্মণও যদি শাস্ত্রজ্ঞ হন তবে তাঁরাও পূজারি হতে পারবেন।

বীর বিনায়ক সাভারকর ছিলেন প্রাজ্ঞ জীবনবোধে ঋদ্ধ। তিনি যে 'হিন্দুত্ব' চেয়েছিলেন, তা সমস্ত সংকীর্ণতামুক্ত এক স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বেগবান প্রবাহ। তিনি জানতেন— আত্মশক্তি, আত্মজাগরণ ও সংকীর্ণতামুক্ত সেই হিন্দুত্বই সমগ্র জাতিকে শক্তিমান এক রাষ্ট্রের অংশ করবে। তাঁর উপলব্ধি হলো— 'হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব'। সবল হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও উন্নতির বীজমন্ত্র। হিন্দু সংখ্যা হ্রাস ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদের সৃষ্টি করে বলে তাঁর স্পষ্ট অভিমত ছিল। আজকের ভারতে বীর সাভারকরের এই উপলব্ধি নির্মম সত্য। তিনি প্রকৃত অর্থে ছিলেন যথার্থ স্টেটস্‌ম্যান। □

মহিলাদের সম্মান রক্ষা করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব

মণীন্দ্রনাথ সাহা

বাঙ্গালি সমজে নতুন কিছু করার প্রবণতা চিরকালই প্রবল। এই ব্যঙ্গাত্মক কবিতায় আদিখ্যেতা লক্ষ্য করে একদা কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তার সরল ভঙ্গিতে লিখেছেন—

‘নতুন কিছু করো, নতুন কিছু করো।
আর কিছু না পারো স্ত্রীদের ধরে মারো।।’

এখন অবশ্য নিজের বউকে মারার দিন আর নেই, বরং বরকে মারার জন্য অনেক আইন চালু হয়েছে। থাক এসব কথা। কিন্তু থাক বললেই কি থাকা যায়? দীর্ঘ ঊনপঞ্চাশ বছর ধরে এরাজ্যে পরের বউকে মারা, নির্যাতন করা এবং ভীষণভাবে অসম্মান করার খোলামেলা ছাড়পত্র পেয়েছিল রাজ্যের জেহাদি মুসলমানরা। যারা আবার রাজনৈতিক দল ভেঙে কারও কাছে ‘সম্পদ’, কারও কাছে ‘দুধেল গাই’ হিসেবে বিবেচিত হতো।

সেই সম্পদেরা বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনে হিন্দু মেয়ে- বউদের ওপর নির্যাতন শুরু করেছিল বানতলা দিয়ে। পরের ঘটনা ধানতলা। সেটাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল ঘোতকাডাঙ্গা। তারপর হাড়োয়া থানার ঘোষপুরে। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। হিন্দু নারীর সতীত্ব নাশ, তাদের বিবস্ত্রকরণ, অলঙ্কার লুটপাট। সব জায়গার দুষ্কৃতীরা সবাই যে বিশেষ সম্প্রদায়ের, তা তাদের নাম থেকেই বোঝা যায়। দিনু মোল্লা, অজগর মোল্লা, রহিম মোল্লা, আবেদ আলি শেখ ইত্যাদি। শুধু ওই চারটি জায়গাতেই নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল নারী নির্যাতন, আতঙ্ক।

বামফ্রন্টের পরবর্তী তৃণমূলের পনেরো বছরের অপশাসনে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জনগোষ্ঠী আরও ব্যাপকভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। তৃণমূল শুরু করেছিল ২০১৩ ক্যানিং থানার নলিয়াখালি, গলাডহড়া গ্রামের হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের আক্রমণের মাধ্যমে। তারপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকায় যেমন— ধুলাগড়, দেগঙ্গা, উলুবেড়িয়া, জলঙ্গি, শিবপুর-সহ নানা স্থানে। সব ক্ষেত্রেই নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা ছিল জেহাদিদের প্রথম এবং প্রধান কাজ। এছাড়া পার্কস্ট্রিট, কামদুনি, নৈহাটি, হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরাম, কুশমণ্ডি, বংশিহারী, হরিরামপুর, কালিয়াগঞ্জ এবং আরও অনেক স্থানে নাবালিকা ও যুবতীদের ধর্ষণের পর হত্যা করা। আর সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে সেই অভয়ার কথা। যার মা একদিন কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, ‘আমার মেয়ের কথা কেউ শুনছে না।’

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেছেন— ‘রাজ্যের নারীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করাই আমার প্রধান কাজ।’ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করাতেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেছেন— ‘এই সরকারের আমলে দুপুর তিনটে হোক বা রাত তিনটে, মহিলারা নির্ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে পারবেন। রাত্রি ৮টার পর মহিলারা বাইরে বেরোতে পারবেন না, সেদিন শেষ হয়ে গিয়েছে। এতদিন মহিলাদের নির্যাতনের ঘটনায় থানায় গেলেও এফআইআর নেওয়া হতো না। কিন্তু বর্তমানে তা হবে না। দলমত নির্বিশেষে দোষীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ এছাড়া তিনি অভয়া মামলা, কয়লা চুরি, বালি চুরির ফাইল নতুন করে খোলার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন— ‘আইন মেনে সব কাজ করতে হবে।’ পালা বদলের পর নব্য বিজেপি সমর্থকদেরও বলেছেন, ‘দলীয় পতাকার আড়ালে কোনো দুর্নীতি, সমাজ বিরোধী কাজ করা যাবে না। এতেই বোঝা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আজ নতুন মোড়ে দাঁড়িয়ে নতুন সরকার এসেছে, নতুন প্রতিশ্রুতি আসছে। আর এতে মানুষের প্রত্যাশাও এখন অনেক বেশি। মানুষ চায় নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা, সম্মান এবং দ্রুত বিচার।

অগ্নিমিত্রা পালের বক্তব্যের রেশ ধরে ভারতের একসময়ের আর্মি চিফ জেনারেল থিমাইয়্যার উক্তি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে—

সময়টা গত শতকের পঞ্চাশের দশকের কথা। তখন আর্মি চিফ ছিলেন জেনারেল থিমায়্যা। সে সময়ে এক আর্মি অফিসার তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে চণ্ডীগড়ের কে সি থিয়েটারে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওখানেই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে। সুরিন্দর সিংহ নামে এক যুবক সিনেমাহলের টয়লেটে ওই মহিলার শ্লীলতাহানি করে।

সঙ্গে সঙ্গে ওই মহিলা ফিরে এসে তাঁর স্বামীকে সবকিছু জানান। তারপর তাঁর স্বামী সামরিক ভদ্রলোক চণ্ডী-মন্দিরে তাঁর আর্মি ব্যাটেলিয়ানের সিও-কে টেলিফোন করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো ব্যাটেলিয়ান এসে সিনেমা হলটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে। সুরিন্দর সিংহকে জোর করে টানতে টানতে হলের বাইরে নিয়ে আসা হয় এবং এক প্রকার উলঙ্গ করে রাস্তায় প্যারেড করানো হয়। এমনকী তাঁর অন্তর্বাসটি একটি আর্মি জোংগা গাড়ির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়।

পরবর্তীতে এই বিষয়টি নিয়ে অনেক জলঘোলা হয়। যার ফলে বিষয়টি সংসদ ভবন পর্যন্ত পৌঁছয়। সংসদ ভবনে জেনারেল থিমায়্যার কাছে যখন ঘটনার ব্যাখ্যা চাওয়া হয় তখন জেনারেল থিমায়্যা যথারীতি সংসদ ভবনে উপস্থিত হয়ে ব্যাখ্যা চাওয়ার উত্তরে কোনোরূপ যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার না করে শান্তস্বরে তিনি শুধু একটি কথাই বলেন— ‘আমরা যদি আমাদের বাড়ির মহিলাদের সম্মান রক্ষা করতে না পারি, তাহলে দেশের সম্মান কী করে রক্ষা করব?’

জেনারেল থিমায়্যার উত্তর শুনে সেদিন সংসদের সেন্ট্রাল হল মুহূর্তেই নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে।

স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনগণ আশা করে রাজ্যের পুলিশ যেকোনো মূল্যে এই রাজ্যের মহিলাদের সম্মান রক্ষা করবে, নচেৎ দেশের সম্মান রক্ষা করা সম্ভব হবে না। ◻

চুক্তিহীন ঝিঙ্গানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বাড়ছে দুশ্চিন্তা

নিয়ল সামন্ত

ভারতীয় ফুটবলের আকাশে ফের ঘনিয়েছে অনিশ্চয়তার কালো মেঘ। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নিবন্ধন ব্যবস্থার তথ্য বলছে, দেশের শীর্ষ স্তরের অন্তত ১৪৮ জন ফুটবলারের চুক্তি চলতি মাসের শেষে শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নতুন মরসুম কবে শুরু হবে, আদৌ হবে কিনা, তা নিয়েই স্পষ্ট কোনো রূপরেখা নেই। ফলে ক্লাবগুলিও নতুন চুক্তি বা বর্ধিত চুক্তির পথে হাঁটতে সাহস পাচ্ছে না। এই উদ্বেগের কেন্দ্রে রয়েছেন ভারত অধিনায়ক সন্দেশ ঝিঙ্গানও।

এফসি গোয়ার অভিজ্ঞ ডিফেন্ডারের চুক্তি শেষ হচ্ছে জুনে। কিন্তু জাতীয় দলের ব্যস্ত সূচির পর তাঁর ভবিষ্যৎ কি তা নিয়ে তিনি অন্ধকারে।

ঝিঙ্গানের কথায়, কয়েক দিন আগেই কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কী। তিনি মজা করেই বলেছিলেন, জুনে জাতীয় দলের খেলা রয়েছে, তার পরে হয়তো ব্যাগপত্র গুছিয়ে চণ্ডীগড়ে ফিরে যেতে হবে। কথার মধ্যে হাস্যরস থাকলেও বাস্তবের চাপ স্পষ্ট। পারিবারিক ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা— সব মিলিয়ে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন দেশের অন্যতম সেরা সেন্টার-ব্যাক।

ভারতীয় ফুটবলে দীর্ঘ দিন কাটিয়েছেন ঝিঙ্গান। কেরালা ব্লাস্টার্স, এটিকে মোহনবাগান, বেঙ্গালুরু এফসি হয়ে এখন এফসি গোয়া— দেশের একাধিক ক্লাবে খেলেছেন তিনি। জিতেছেন সুপার কাপ, ফেডারেশন কাপও। কিন্তু এত বছরের অভিজ্ঞতায় এমন অনিশ্চয়তার মুখে তিনি আগে পড়েননি।

আসলে ভারতীয় ফুটবলের প্রশাসনিক জটিলতা ফের সামনে এসেছে। ফেডারেশনের বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব নিয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ক্লাবগুলির একাংশ নিজেদের মডেল প্রস্তাব পেশ করেছে, অন্যদিকে ফেডারেশন নতুন বাণিজ্যিক অংশীদার খুঁজছে। দুই পক্ষের টানাপোড়েনে আগামী মরসুমের কোনো স্পষ্ট রূপরেখাই তৈরি হয়নি।

এই পরিস্থিতি অবশ্য নতুন নয়। গত ডিসেম্বরেও ভারতীয় ফুটবল একই সঙ্কটে পড়েছিল। এফএসডিএলের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ফেডারেশন এবং ক্লাবগুলির মধ্যে মতভেদ এতটাই বাড়ে যে শেষ পর্যন্ত ক্রীড়ামন্ত্রকের হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল।

ঝিঙ্গান স্পষ্টই বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতি আগের চেয়েও উদ্বেগজনক। তাঁর মতে, জানুয়ারি মাসে অন্তত আশা ছিল কোনো না কোনো ভাবে লিগ শুরু হবে। কিন্তু এখন অনেকেরই আশঙ্কা, গোটা কাঠামোই ভেঙে পড়তে পারে। ক্লাব বন্ধ হয়ে গেলে শুধু ফুটবলার নন, অসংখ্য কর্মচারী, কোচ, সাপোর্ট স্টাফের জীবন-জীবিকাও বিপন্ন হবে।

জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে ঝিঙ্গান অবশ্য দলের তরুণদের সাহস জোগানোর চেষ্টা করছেন। সেই তরুণদের একজন বরিস সিংহ। মণিপুরের ওই ফুটবলারের বয়স ২৬। তাঁর চুক্তিও শেষ হচ্ছে এই মাসেই। ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ তাঁর মধ্যেও প্রবল।

বরিস জানাচ্ছেন, ড্রেসিংরুমে এই বিষয় নিয়েই প্রায়শই আলোচনা হয়। ফুটবলারদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। তাঁর মতে, ফেডারেশন এবং লিগ কর্তৃপক্ষের দ্রুত সমাধানের পথে হাঁটা উচিত। কারণ শুধু খেলোয়াড় নন, ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষের ভবিষ্যৎও জড়িয়ে রয়েছে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে।

বরিসের মতো তরুণরা এই কঠিন সময়ে ভরসা খুঁজছেন 'সন্দেশ পাজি'-র মধ্যে। জাতীয় দলের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে লিগ নিশ্চয়ই হবে, যদিও কবে শুরু হবে তা কেউ জানেন না। কিন্তু বাস্তব হলো ঝিঙ্গান নিজেও নিশ্চিত নন।

এরই মধ্যে জাতীয় দলের শিবিরে যোগ দেবেন ঝিঙ্গান। সামনে ইউনিটি কাপ। দেশের জার্সি গায়ে চাপানোর দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু মাঠে নামলেও মাথার ভিতরে ঘুরপাক খাবে ক্লাব বনাম ফেডারেশনের এই সংঘাত। ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান বাস্তব যেন এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি।

মাঠে লড়াই চলছে ট্রফির জন্য, আর মাঠের বাইরে ফুটবলাররা লড়ছেন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। প্রশাসনিক অচলাবস্থা যত দীর্ঘায়িত হবে, ততই গভীর হবে সঙ্কট। আর তার সবচেয়ে বড়ো মূল্য দিতে হবে সেই ফুটবলারদের, যাঁরা দেশের ফুটবলকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রতিদিন মাঠে নেমে লড়াই করে চলেছেন। □

কথা সরিৎসাগর

এক টেকো ও ভণ্ড চিকিৎসক

একটি লোক ছিল। তার জমিজমা, টাকাপয়সা কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। তবু তার মনে শান্তি নেই। তার মাথায় একটিও চুল নেই। টাক মাথাটি একটা তামার পাত্রের মতো দেখতে লাগে। এনিয়ে অনেকেই তাকে ঠাট্টা-তামাশা করে। লোকের কথায় সে বড়োই লজ্জা পায়।

লোকটি বড়োলোক হলেও কিন্তু খুব বোকা। বুদ্ধিসুদ্ধি খুবই কম। একদিন একটি ঠগলোক এল তার কাছে। লোক ঠকিয়ে পয়সা হাতানোই তার পেশা। সে টেকোকে বলল, দেখুন, আমার চেনা জানা এক মস্ত বড়ো ডাক্তার আছে। তার কাছে এমন অব্যর্থ ওষুধ আছে, যাতে টাক মাথায় চুল গজাবেই গজাবে। তুমি যদি বলো, তোমাকে আমি তার সন্ধান দিতে পারি। তোমার টাকে এমন চুল গজাবে যে লোকে ঠাট্টা তামাশা তো দূরের কথা, তোমাকে দেখে সবাই হিংসায় জ্বলবে।

শুনে তো টেকো আনন্দে আটখানা। সে ওই ঠগকে বলল, যত টাকা লাগে আমি খরচ করতে রাজি আছি। তুমি শুধু সেই ডাক্তারকে আমার কাছে নিয়ে এসো। যদি সত্যিই আমার মাথায় চুল গজায়, তাহলে যত টাকা লাগে তা তো দেবই, তোমাকেও খুশি করে দেব।

এদিকে সেই ঠগ লোকটা ডাক্তারকে আজ আনব, কাল আনব বলে টোকোর থেকে টাকা নিয়ে যেতে লাগল, আর বোকা টেকো কিছু না ভেবেই টাকা দিয়ে যেতে লাগল। তার মনে বড়োই আশা যে তার মাথায় এবার চুল গজাবে।

বেশ কিছুদিন এভাবে চলার পর ঠগ লোকটা একদিন সত্যিই এক ডাক্তারকে নিয়ে এল। ডাক্তারও বেশ কিছুদিন ধরে টেকোর চিকিৎসা করে যেতে লাগল। আসলে ডাক্তারটিও এক মস্ত ঠগ। মিথ্যা চিকিৎসার নামে সে টেকোর কাছ থেকে অনেক টাকা হাতিয়ে নিল। বোকা টেকো কিছুই বুঝতে পারছে না । পরম বিশ্বাসে টাকে চুল গজানোর লোভে টাকা খরচ করেই চলেছে।

একদিন সেই ঠগ ডাক্তার নিজের মাথা থেকে পরচুলাটা এক টানে খুলে ফেলল। তার মস্ত টাক চক চক করছে। কিন্তু কী কাণ্ড, টেকো এতই বোকা আর ভালো মানুষ যে তখনোও সেই ডাক্তারকে বিশ্বাস করে বসে আছে। বার বার বলছে, ও ডাক্তারবাবু, আপনার সেই অব্যর্থ ওষুধটা দিন না আমায়। মাথাভর্তি চুলের খুবই শখ আমার। বড়ো লজ্জা করে টাকমাথায় ঘুরে বেড়াতে।

ঠগ ডাক্তার তখন হাসিতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। টেকোকে বলে, দেখছেন না, আমার নিজের মাথায় টাক? আমি যদি সত্যিই টাকে চুল গজাতে পারতাম, তাহলে নিজের মাথাটি এরকম থাকত? আমি যে কিছুই করতে পারবো না সেটা বোঝাতেই তো পরচুলা খুলে আপনাকে দেখালাম, তবু আপনার মাথায় বিষয়টা ঢুকলো না? বুদ্ধির বলিহারি আপনার !

এককথা বলে ঠগ ডাক্তার টেকোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। টেকোর টাকে আর চুল গজালো না।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

পেঞ্চ

পেঞ্চ জাতীয় উদ্যানটি মূলত মধ্যপ্রদেশের সিওনি ও ছিন্দওয়াড়া জেলায় অবস্থিত। তবে এই উদ্যানের কিছু অংশ পার্শ্ববর্তী মহারাষ্ট্র রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত। এটির আয়তন ৭৫৮ বর্গকিলোমিটার। এই উদ্যানে বারোশোরও বেশি প্রজাতির উদ্ভিদ এখন পর্যন্ত চিহ্নিত করা গেছে। বন্যপ্রাণীতেও সমৃদ্ধ এই উদ্যান। চার শিংওয়ালা হরিণ এই উদ্যানের অন্যতম আকর্ষণ। তবে বহু সংখ্যায় বেঙ্গল টাইগার রয়েছে। এই উদ্যানের ভেতরে রয়েছে ছোটো ছোটো পাহাড় ও মিশ্র সেগুনবন। ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য এই উদ্যান জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বন্ধ থাকে। পরিদর্শনের সেরা সময় হলো নভেম্বর থেকে মে মাস।

এসো সংস্কৃত শিখি-১১৪

अहं न जानामि (আমি জানি না)

मस्तके कति केशा: सन्ति ?

মাথায় কতগুলি চুল আছে?

अहं न जानामि।

আমি জানি না।

कोषे कति रुप्यकानि सन्ति ?

पिता गृहे अस्ति वा ?

मार्गे कति वाहनानि सन्ति ?

परीक्षा कदा अस्ति ?

आकाशे कति नक्षात्राणि सन्ति ?

सङ्गीता किमर्थं क्रन्दति ?

पुस्तकं कदा ददाति ?

एतत् यानं कुत: आागच्छति ?

शिक्षिका कथम् अस्ति ?

वृष्टि भविष्यति वा ?

ভালো কথা

আম কুড়ানো

এখন আমাদের পাড়ায় রামুদের বাগানে আম পেকেছে। মাত্র চারটে গাছ, তাতেই সবাই বাগান বলে। রামুর বাবা বলে, ওই বাগানে ভূত আছে। তাই কেউ ওখানে আম কুড়াতে যায় না। আমিও যাই না। রাতে যে আম পড়ে, অনেক বেলাতে রামুর বাবা সেগুলো নিয়ে যায়। সেদিন সোনাদাদা বলছিল ভূত বলে কিছু নেই। কেউ যাতে আম কুড়িয়ে নিয়ে না যায় তাই রামুর বাবা ওকথা রটিয়ে দিয়েছে। তার পর দিন থেকে আমি খুব ভোরে উঠে সব আম কুড়িয়ে নিয়ে আসছি। রামুর বাবাকে বোকা বানিয়ে খুব মজা হচ্ছে। পাকা আম খেতে মজা।

রণদেব রায়, নবমশ্রেণী, ফরাক্কা ব্যারেজ কলোনি, মুর্শিদাবাদ

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

অনাসৃষ্টি

পূজা সেন, নবমশ্রেণী, ঝালদা, পুরুলিয়া

দিনের বেলা বেজায় রোদ
রাতের বেলা বৃষ্টি,
ঠাকুমা বলে গ্রীষ্মকালে
একি অনাসৃষ্টি!
বোনটি বলে খুবই ভালো
আম পাকার যে সময়,
তাই তো বুঝি রোদ বৃষ্টি
একটু অনিয়ম।

রোদ বৃষ্টিতে কালো জাম
পড়বে টুপ টুপ করে,
কোঁচর ভর্তি করে করে
আনবো নিয়ে ঘরে।
দাদা বলে এই অবস্থায়
লিচু পাকবে বেশ,
আর তাড়াতাড়ি ফজলি পাকবে
যদি থাকে এর রেশ।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

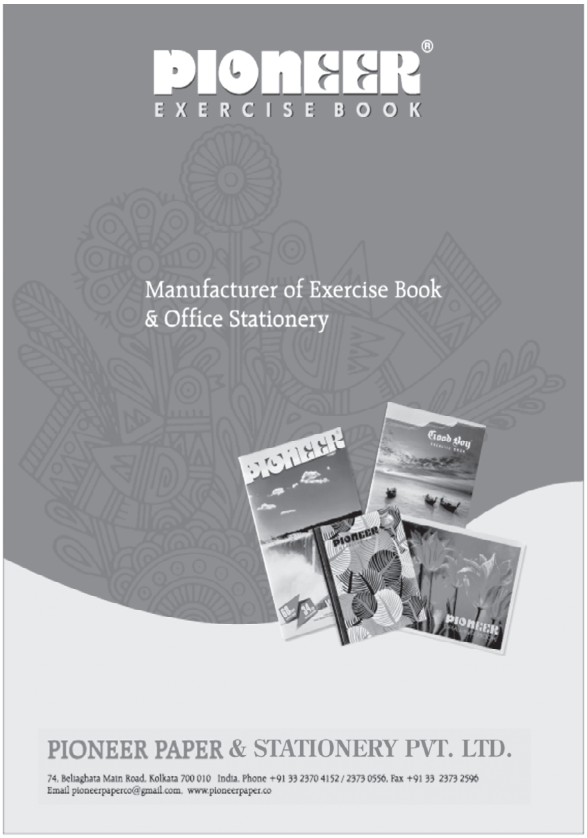

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

★ RETIREMENT PLANNING.
★ CHILDREN EDUCATION FUND.
★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
★ WEALTH CREATION.
★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানায়কদের বিচারের অভিঘাতেই ভারত ছেড়ে পালিয়েছিল ইংরেজ

প্রণব দত্ত মজুমদার

১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করল। ১৮ আগস্ট প্লেন দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদ প্রচারিত হলো। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক ও সেনাপ্রধানের অ্যাটাক, মুলতান, নীলগঞ্জ ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গার সেনাক্যাম্পে যুদ্ধবন্দি করে রাখা হলো। শোনা যায় বহু সৈনিককে ওই সমস্ত জায়গায় গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন সেনাপ্রধান--- শাহনাওয়াজ খান, প্রেম শেহগল ও গুরুবক্স সিংহ ধিলংকে দিল্লির লালকেল্লায় এনে 'যুদ্ধ অপরাধী' হিসেবে বিচার আরম্ভ করা হলো। উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে ভারতবাসীর মনোবল ভেঙে দেওয়া যাতে ভবিষ্যতে ভারতীয়রা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে সাহস না পায়; কিন্তু লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীর সেনানায়কদের বিচার আরম্ভ হলে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য নেতাজী সুভাষ এবং তাঁর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দুঃসাহসিক আত্মবলিদানের কাহিনি, তাঁদের বীরত্ব গাথা দাবানলের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। দেশপ্রেমের আবেগে সারা দেশ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। লালকেল্লায় দেশপ্রেমিক সেনাদের শাস্তিদানের জন্য বিচার হচ্ছে দেখে ভারতের জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, দেশের বিভিন্ন জায়গায় তীব্র বিক্ষোভ আরম্ভ হয়ে গেল। আওয়াজ উঠল— 'আজাদ হিন্দ ফৌজ কো ছোড় দো, লাল কিল্লা তোড় দো।'

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন গুঁড়িয়ে দেওয়ার পরে এবং ৩ বছর ধরে কংগ্রেসের নেতারা জেলে থাকার ফলে নেতারা সবাই হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন। নতুন করে আন্দোলন গড়ে তোলার মতো শক্তি, সাহস বা উচ্ছ্বাস কিছুই তখন আর বাকি ছিল না। যুদ্ধজয়ী ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার মতো কোনো আশা ভরসা আর ছিল না তাঁদের কাছে। ঠিক এইরকম সময়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীদের বিচারের অভিঘাত যেন সুনামির মতো আছড়ে পড়লো ভারতের বুকে। জন্ম দিল এক নতুন তীব্র স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতার আন্দোলনের যা ছিল ১৮৫৭ সালের মহাসংগ্রামের চাইতেও তীব্র যা কংগ্রেস কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। ভারতবাসীর কাছে যেন এক নতুন আশার আলো দেখা দিল।

এই বিচারের কাজ আরম্ভ হতেই ইংরেজ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সৈনিকরা আবেগতাড়িত হয়ে পড়লেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর দেশাত্মবোধ তাঁদের রক্তেও

ফঃ ৬

সঞ্চারিত হয়ে গেল। ইংরেজ বাহিনীর ভারতীয় সৈনিকরা এতদিন তাঁদের ইংরেজ অফিসারদের নানারকম বৈষম্যমূলক ও অমানবিক আচার ব্যবহার মুখ বুজে সহ্য করে কাজ করে যাচ্ছিলেন কিন্তু আজাদ হিন্দ বাহিনীর আত্মত্যাগের বীরগাথা তাদের রক্তে আত্মসম্মানের স্বাভিমানের বীজ বপন করে দিল যেন, তাঁরা ইংরেজ প্রভুদের সেসব অমানবিক ব্যবহার আর মেনে নিতে রাজি হলেন না, তাঁরা ইংরেজ প্রভুদের বিরুদ্ধে দিকে দিকে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিলেন।

১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল Royal Indian Navy-তে। কলকাতা, মাদ্রাজ, করাচী, কোচিন ইত্যাদি স্থানে। তাঁরা জাহাজের মাস্তুল থেকে 'ইউনিয়ন জ্যাক' টেনে নামিয়ে ভারতের তেরঙ্গা পতাকা উড়িয়ে দিলেন। দিল্লি ও করাচী বন্দরের রাস্তায় তারা নেতাজী সুভাষের ছবি হাতে নিয়ে মার্চ করতে করতে আজাদ হিন্দ বাহিনীর স্লোগান দিতে থাকলেন— 'জয় হিন্দ' 'দিল্লি চলো'। ইংরেজ দেখলেই তেড়ে যেতে লাগলেন। জাহাজের যোগাযোগ মাধ্যমের (Signals & Radio Communications) কর্মীরা, যাদের বেশিরভাগই ছিল ভারতীয়, তারা বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার ও বিদ্রোহের খবর সমস্ত নৌবাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে আন্দোলনকে দ্রুত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

এই আন্দোলনের ঢেউ লাগলো Royal Indian Airforce-এর গায়ে। বোম্বের মেরিন ড্রাইভের কাছে বিমান বাহিনীর ক্যাম্পের ভারতীয় সেনাদের মধ্যে তাদের ব্রিটিশ অফিসারদের জাতিমূলক বৈষম্যের অমানবিক আচার আচরণে নানারকম ক্ষোভ বিক্ষোভ ছিলই, তারাও এখন এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ করে দিলেন। তাঁরা তাঁদের ব্রিটিশ অফিসারদের হুকুম তামিল করতে অস্বীকার করলেন। তারাও আজাদ হিন্দ বাহিনীর স্লোগান দিতে আরম্ভ করলেন। এই আন্দোলনের ঢেউ Royal Indian Airforce-এর অন্য Airbase গুলিতেও ছড়িয়ে পড়ল।

২২ ফেব্রুয়ারি বোম্বাইয়ে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এই ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন। জনতা পুলিশ-ফাঁড়ি আক্রমণ করে। সামরিক বাহিনীর প্রায় ৪০টি ট্রাক ধ্বংস হয়।

নৌবাহিনীর বিদ্রোহের পরে জব্বলপুরের স্থলবাহিনীর মধ্যেও বিদ্রোহ দেখা দিল। ১৯৪৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি, সেখানকার ভারতীয় সৈনিকরা তাঁদের ব্রিটিশ অফিসারদের হুকুম অমান্য করে কাজ ছেড়ে ব্যারাক ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানায়কদের বিচারের অভিঘাত সারাদেশ জুড়ে ভারতীয় সৈনিক ও আপামর জনতার মধ্যে স্বাভিমান ও স্বাধীনতা স্পৃহার যে আবেগ তৈরি করেছে তাতে যেন বিদ্রোহের এক ভয়ানক জ্বালামুখ খুলে গেল!

সেনা বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় জনগণের মধ্যেও বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, হরতাল ইত্যাদি শুরু হয়ে গেল। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর (২১-২৩) কলকাতায় উত্তাল বিক্ষোভ হয়েছিল। তাতে পুলিশ গুলি চালালে ৩১ জন মারা যান এবং ১৭৯ জন আহত হন। বঙ্গের গভর্নর যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি লেখেন— পুলিশ গুলি চালালেও বিদ্রোহী জনতা জমি ছাড়েনি। কিছুক্ষণের জন্য হয়তো সরে গেছে, আবার রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছে। অনেক জায়গাতেই জনতা মারমুখী হয়ে উঠল, তাঁরা সাদা চামড়ার লোক দেখলেই তেড়ে যেতে লাগল। ইংরেজ নারী-পুরুষরা খুব ভয়ের মধ্যে দিন কাটাতে লাগল।

দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে একে একে ইংরেজ গভর্নর যেমন মাদ্রাজের গভর্নর, NWFP-এর গভর্নর, সেন্ট্রাল প্রভিন্সের গভর্নর, বেঙ্গল গভর্নরের দুশ্চিন্তায় ভরা গোপন রিপোর্ট পাঠাতে আরম্ভ করলেন যে তাঁদের পক্ষে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ইংরেজ নারী-পুরুষদের জীবন রক্ষা করা ইত্যাদি ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ছে।

ভারত জুড়ে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল তাতে ভারতে যে সব ইউরোপিয়ান বসবাস করতেন তাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল; বিশেষ করে নারী ও শিশুরা দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ইংরেজ সরকারের উপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন। ইংরেজ সরকার এদেশে বসবাসকারী ইউরোপিয়ানদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এমন ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে পরিস্থিতি যদি আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তবে তাঁরা যাতে বিমানে অথবা জাহাজে করে ভারত ছেড়ে পালাতে পারেন। তার জন্য পাঁচ ডিভিশন জাহাজের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল এবং পরিকল্পনা করে অনেক ইউরোপিয়ান পরিবারকে বিমানবন্দর ও নৌবন্দরের কাছাকাছি জায়গায় এনে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল— যাতে সময়মতো পালানো যায়। এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয়েছিল--- 'Operation Gondola'। এসব থেকেই বোঝা যায় ইংরেজরা কী সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিল। গান্ধীজী ও কংগ্রেসের অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ইংরেজ সরকার এত ভীত ছিল না, তাঁরা নানারকম কায়দাকানুন ফন্দিফিকির করে দিব্যি রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু এবার সত্যি তাদের হাড়ে কাঁপন ধরেছে।

১৮৫৭ সালের মহাসংগ্রামকে ইংরেজ সামলাতে পারলেও এই বিদ্রোহকে সামলাবার ক্ষমতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্লান্ত এবং বিপুলভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত ইংরেজ সরকারের ছিল না। ভারতে তখন দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সৈনিকদের সংখ্যা প্রায় কুড়ি লক্ষ আর গোরা সৈন্যের সংখ্যা এদেশে তখন মাত্র চল্লিশ হাজার; তাও আবার এইসব সৈনিক যুদ্ধ শেষে দেশে পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে আছে। অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতি! ব্রিটিশ কর্তারা হিসেব কষে দেখলেন— যে ভারতীয় সৈনিকদের উপর ভরসা করে তারা এতদিন ভারত শাসন করেছে তাদের উপর যখন আর ভরসা করা যাচ্ছে না, তখন এত বড়ো দেশকে সামলাতে গেলে অন্ততপক্ষে পাঁচ ডিভিশন ব্রিটিশ সেনার প্রয়োজন এবং লন্ডন থেকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ছয় বছর ধরে যুদ্ধ করে ব্রিটিশ সেনারা তখন ক্লান্ত; তারা আর বিদেশবিভুঁইয়ে গিয়ে যুদ্ধ করতে আগ্রহী নয়। তাছাড়া যুদ্ধের ফলে ব্রিটেনে তখন তীব্র অসন্তোষ চলছে। এই পরিস্থিতিতে পাঁচ

ডিভিশন সেনাকে ভারতে স্থাপিত করা অসম্ভব। ইংরেজ কর্তারা অনুভব করলেন যাদের সাহায্যে এই বিরাট দেশকে তারা এতদিন শাসন করেছেন সেই ভারতীয় সৈনিকদেরই আনুগত্যে যখন ফাটল ধরে গেছে, তখন মানসম্মান নিয়ে এদেশে থাকা আর সম্ভব নয়। তারা মনস্থ করে ভারতকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিয়ে এদেশ ছেড়ে চলে যাবার।

কংগ্রেসের নেতাদের মাধ্যমে এই মহাবিদ্রোহকে কোনোরকমে সামাল দিল ইংরেজ সরকার, আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানায়কদের শাস্তির বিষয়টি চাপা পড়ে গেল। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারিতে ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলিতে নির্বাচন হয়েছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচারের অভিঘাতে দেশজুড়ে যে মহাবিদ্রোহ হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে চতুর কংগ্রেস তার পুরো হাওয়া নিজেদের পালে লাগাতে সক্ষম হয়েছিল; যদিও তারাই ফ্যাসিস্ত বলে দিনরাত সুভাষচন্দ্রকে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করেছে। কংগ্রেস অমুসলমান আসনের ৯০ শতাংশ নিজেদের ঝুলিতে তুলতে সক্ষম হয়। মুসলিম লিগ পাকিস্তানের দাবিকে সামনে রেখে নির্বাচন লড়ায় মুসলমান আসনের ৮৭ শতাংশ দখল করে নেয়। অবিভক্ত বঙ্গে মুসলিম লিগ মেজরিটি হওয়ায় মুসলিম লিগের সরকার গঠিত হয়। ১৯৪৬ সালের ২৩ মার্চ ব্রিটিশ সরকারের 'ক্যাবিনেট মিশন' ভারতে আসে নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে কথা বলতে।

মুসলিম লিগ নেতা জিন্না 'দ্বিজাতি তত্ত্বে'র ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশের দাবি করে। কমিউনিস্টরা তার এই দাবিকে সমর্থন করে। কংগ্রেস-সহ অন্য দলগুলি এই দাবি মানতে অস্বীকার করে। এই নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। মুসলিম লিগ জানিয়ে দেয় ১৫ আগস্টের মধ্যেই কংগ্রেস বা অন্য দলগুলি যদি মুসলমানদের জন্য পাকিস্তানের দাবি মেনে নিয়ে সিদ্ধান্ত না জানায় তবে তারা ১৬ আগস্ট থেকে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' করে পাকিস্তানের দাবি আদায় করে নেবে। ১৫ আগস্টের মধ্যে কংগ্রেসের কাছ থেকে সদুত্তর না পেয়ে মুসলিম লিগ ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' নামক ইসলামিক জিহাদ আরম্ভ করল কলকাতার বুকে। কলকাতা জুড়ে হিন্দুদের হত্যা, লুটতরাজ, অগ্নি সংযোগ, দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙা, নারীর সতীত্ব লুণ্ঠন ইত্যাদি চলেছিল তিন দিন ধরে। প্রায় ৫ হাজার মানুষের প্রাণ গিয়েছিল। আহত হয়েছিল প্রায় ১৫ হাজার মানুষ। কলকাতার রাস্তায়, নর্দমায় মৃতদেহের স্তূপ, চারদিকে শকুনের ভিড়। ভয়াবহ সেই ঘটনা। ইতিহাসে যা The Great Calcutta Killings নামে পরিচিত হয়ে আছে।

এই ঘটনা ঘটার পরেও গান্ধীজী বা কংগ্রেসের কাছ থেকে পাকিস্তানের দাবিতে কোনো ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে মুসলিম লিগ আবারও পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে হিন্দু নরসংহার শুরু করে ১০ অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন। মুসলিম লিগের গুন্ডারা হিন্দুদের উপর হিংস্র পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, হত্যা, দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙা। কুমারী মেয়েদের জোর করে মুসলমানদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া, বিবাহিতাদের শাঁখা পলা ভেঙে সিঁদুর মুছে সতীত্ব লুণ্ঠন করা, আর হয়েছিল ব্যাপক হারে ধর্মান্তরণ। প্রায় দু' সপ্তাহ ধরে চলেছিল এই নারকীয় পৈশাচিক কাণ্ড, ইতিহাসে যা— The Noakhali genocide বলে পরিচিত। মুসলিম লিগের এই ভয়াবহ জেহাদি রূপের কাছে গান্ধীজী ও তাঁর কংগ্রেস নতজানু হলো। ভারত ভাগের বিষয় মেনে নিল তাঁরা।

অবশেষে, ১৯৪৬ সালে ডিসেম্বর, ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের নেহরু, মুসলিম লিগ নেতা জিন্না, লিয়াকত আলি খান, শিখদের নেতা সর্দার বলদেব সিংহ-কে লন্ডনে আমন্ত্রণ করে আলাপ আলোচনা করে এবং সিদ্ধান্ত হয় ১৯৪৮ মার্চ-এর মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তর করবে ব্রিটিশ সরকার।

ভারতকে বিভাজিত করে ক্ষমতা হস্তান্তরের মতো জটিল এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর ব্যাপারটি সুসম্পন্ন করার জন্য তখনকার ভাইসরয় ওয়াভেল-কে সরিয়ে অত্যন্ত ডাকাবুকো, দাপুটে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ব্রিটিশ নৌবাহিনীর প্রধান এবং ব্রিটিশ রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মাউন্ট ব্যাটনকে ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয়

করে পাঠায় ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

দেশভাগের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ১৯৪৭ সালের ২ ও ৩ জুন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটন মিটিং ডাকেন। সেই মিটিঙে উপস্থিত ছিলেন— কংগ্রেসের পক্ষে আচার্য কৃপালনি (তখন কংগ্রেসের সভাপতি), জওহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল, মুসলিম লিগের পক্ষে মহম্মদ আলি জিন্না (তখন মুসলিম লিগের সভাপতি), লিয়াকত আলি খান, আব্দুর রব নিস্তার এবং শিখদের নেতা সর্দার বলদেব সিংহ। ওই মিটিঙে ভাইসরয় তাঁর প্ল্যান (যার সরকারি নাম— HM Government's Statement 3 June 1947) ব্যাখ্যা করে ভারত কীভাবে ভাগ হবে তার সিদ্ধান্ত পাকা করে নেন। জিন্না কিছুটা ওজর আপত্তি করলেও অবশেষে ভাইসরয়ের চাপে তা মেনে নিতে বাধ্য হন।

১৯৪৭ সালের ৩ জুন বিকেল ৩-৩০ এ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি 'হাউস অব কমনস'-এ ঘোষণা করেন যে ভারতবর্ষকে বিভাজিত করে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে; এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ ও পঞ্জাবের লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি যদি পাশ করে তবে বঙ্গ ও পঞ্জাবকে ভাগ করে একটি করে অংশ ভারতভুক্ত হবে। ওই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গের অ্যাসেম্বলিতে ভোটাভুটির মাধ্যমে বঙ্গের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে আলাদা করে ভারতভুক্ত করে বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ডের সিদ্ধান্ত পাকা হয়, যার নাম হয় পশ্চিমবঙ্গ। অনুরূপভাবে পঞ্জাবের অ্যাসেম্বলিতে ভোটাভুটির মাধ্যমে শিখ ও হিন্দুদের জন্য পঞ্জাবের একটি অংশ ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত পাকা হয়। হিন্দু মহাসভার নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তীব্র আন্দোলনের ফলেই বঙ্গপ্রদেশ ও পঞ্জাবের ভাগ সম্ভব হয়েছিল, সে অন্য ইতিহাস।

মাউন্টব্যাটন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের অনেক আগেই ভারত ভাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ সেরে ফেলেছিলেন। ১৪ আগস্ট মুসলমানদের জন্য গঠিত পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। বাকি ভারতবর্ষ সবধর্মের লোকের বাসভূমি হিসেবে স্বাধীনতা পায় পরের দিন ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭। জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বকেই যখন মান্যতা দেওয়া হলো তাহলে স্বাভাবিক যুক্তিতেই ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা উচিত ছিল না কি?

একথা বলতেই হবে যে রাসবিহারী বসু কঠিন সংগ্রাম করে যে আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি করেছিলেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে যে আজাদ হিন্দ বাহিনী দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করেছিল, তাদের যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে বিচারের অভিঘাতই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভীত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তা না হলে বিশ্বযুদ্ধজয়ী ব্রিটিশ, যারা কিনা ১৯৪২ সালে কংগ্রেস তথা গান্ধীজীর কোনো দাবিকে মান্যতা না দিয়ে 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-কে নির্মমভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল এবং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কংগ্রেস যখন গুটিয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে গেছিল তখন বিশ্বযুদ্ধ শেষে বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি কি অলৌকিক কারণে ভারতবর্ষকে তড়িঘড়ি স্বাধীনতা দিতে মনস্থ করেছিল?

নিশ্চয়ই তাঁরা গান্ধীজী ও কংগ্রেসের অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন বা গান্ধীজীর চরকার ভয়ে পালিয়ে যাননি।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি সুন্দর বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে— 'দে দি হামে আজাদি বিনা খড়্গ বিনা ঢাল, সাবরমতি কে সন্ত, তুনে কর দিয়া কামাল।' আধুনিক গবেষকদের লেখা কিন্তু অন্য কথা বলে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর বই 'The Phases of India's Struggle for Freedom' এ লিখেছেন— 'In particular the revelation made by INA trial and the reaction it produced in India, made it quite plain to the British, already exhausted by the war, that they could no longer depend upon the loyalty of the sepoys for maintaining their authority in India. This had probably the greatest influence upon their final decision to quit India.' (page-442, Satyameva Jayate-by Abhijit Joag)

ভারতের স্বাধীনতার সময়কালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ক্লিমেন্ট অ্যাটলি। তিনি ১৯৫৬ সালে কলকাতায় এসেছিলেন। তখন পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর জাস্টিস ফণীভূষণ চক্রবর্তী ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির কারণ জানার কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন তাঁর কাছে। সুভাষচন্দ্র বসুর INA-এর বিচারের ফলে যে সেনা বিদ্রোহ হয়েছিল তার থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতিই তাঁদের ভারত ছেড়ে যাওয়ার কারণ বলে তিনি স্বীকার করেন। ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে গান্ধীজীর ভূমিকা কী ছিল তা জিজ্ঞেস করায় তিনি বিদ্রূপের সুরে বলেছিলেন— M-I-N-I-M-A-L. অর্থাৎ নগণ্য। (P-173, Bose or Gandhi Who got India Her Freedon-by Major General Dr. G.D. Bakshi).

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং তার সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আত্মত্যাগ এবং আজাদ হিন্দ বাহিনী গড়ে তোলার কারিগর মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর মরণপণ লড়াইয়ের কাহিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত।

তথ্যসূত্র :

১. কর্মবীর রাসবিহারী--- অধ্যাপক বিজনবিহারী বসু।

২. বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু— মনোরঞ্জন ঘোষ।

৩. স্বাধীনতার যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজ— শিশির কুমার বসু।

৪. A Beacon Across Asia— S.K. Bose, A. Werth, S.A. Ayer.

৫. Bose An Indian Samurai— Maj Gen (Dr.) GD Bakshi, VSM (retd).

৬. Bose or Gandhi Who Got India Her Freedom--- Maj Gen (Dr) GD Bakshi, VSM (retd).

৭. Revolutionaries--- by Sanjeev Sanyal.

৮. Satyameva Jayate by Abhijit Joag.

৯. যারা মুসলমান বলে গর্ব বোধ করেন— অমলেশ মিশ্র।

রাতের অন্ধকারে 'অপারেশন সানসাইন' মনে আছে তো কমরেড?

বিপ্লব বিকাশ

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটেছে। দীর্ঘদিন ধরে চলা একাধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে যখন একটি জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তখন স্বাভাবিকভাবেই আমূল বদল আসতে শুরু করেছে প্রশাসনের স্তরে স্তরে। আইনের শাসন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড়ো পদক্ষেপটি দেখা যাচ্ছে দেশের অন্যতম লাইফলাইন— ভারতীয় রেলের চত্বরগুলিতে। হাওড়া, শিয়ালদহ থেকে শুরু করে রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন ও তার চারপাশের চত্বরকে বেআইনি দখলদার মুক্ত করার এক বিশাল অভিযান শুরু করেছে রেল কর্তৃপক্ষ।

যে রেল স্টেশনগুলিতে এতদিন সাধারণ যাত্রীদের হেঁটে চলার জায়গা ছিল না, যেখানে স্টেশনের ভেতরে-বাইরে হকারদের বেআইনি দখলের কারণে প্রতিনিয়ত পকেটমারি, ভিড় আর চরম বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকত, আজ সেখানে সাধারণ নাগরিক ও নিত্যযাত্রীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। অথচ, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও হাস্যকর বিষয় হলো, এই জনমুখী ও আইনি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জনতাকে খেপিয়ে তুলতে মাঠে নেমে পড়েছে এ রাজ্যের বামপন্থীরা। সাধারণ মানুষের স্বার্থ এবং রাষ্ট্রীয় সুরক্ষাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কমরেডরা এখন খেলছেন সস্তা সহানুভূতির এক 'দ্বিমুখী খেলা'। কিন্তু আজ পশ্চিমবঙ্গের সচেতন মানুষ এই ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিতে বদ্ধপরিকর। কমিউনিস্টদের সেই চরম পাপের ইতিহাস আজ আবার মনে করিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে। কমরেড, আজ আপনারা বড়ো বড়ো কথা বলছেন, গরিব হকারদের জন্য চোখের জল ফেলছেন। আপনাদের কি মনে নেই ১৯৯৬ সালের সেই অভিশপ্ত ২৪ নভেম্বরের কালরাতের কথা? পশ্চিবঙ্গের মানুষ কিন্তু ভোলেনি।

তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের প্রভাবশালী পরিবহণ মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী এবং কলকাতা কর্পোরেশনের যৌথ পরিচালনায় মহানগরের বুকে নেমে এসেছিল এক বামপন্থী তাণ্ডব, যার পোশাকি নাম ছিল— 'অপারেশন সানশাইন'। সেদিন কোনো আলোচনা হয়নি, কোনো বিকল্প পুনর্বাসনের মানবিক চিন্তাও স্থান পায়নি। ঠিক ২৪ নভেম্বর মাঝরাতে, যখন খেটে খাওয়া হকাররা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিলেন, তখন বুলডোজার আর পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আপনাদের দলীয় ক্যাডার ও প্রশাসন।

গড়িয়াহাট থেকে শ্যামবাজার, হাতিবাগান থেকে শিয়ালদহ— এক রাতের মধ্যে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল হাজার হাজার গরিব মানুষের রুটিরুজি। লক্ষ লক্ষ টাকার মালপত্র পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছিল, নর্দমায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল হকারদের পরিশ্রমের পুঁজি। সেই রাতের নির্মম ধ্বংসলীলার পর কলকাতার ফুটপাথ রক্ত আর চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল। আপনাদের সেই তথাকথিত 'প্রগতিশীল' উচ্ছেদের ধাক্কা সামলাতে না পেরে পরবর্তী মাসগুলিতে দেনার দায়ে এবং অনাহারে প্রায় ১৮ জন হকার আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন! সেদিন কোথায় ছিল আপনাদের এই কুম্ভীরাশ্রু?

আজ যখন রেল কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ আইনি পথে, যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং স্টেশনের আধুনিকীকরণের জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে উচ্ছেদ চালাচ্ছে, তখন আপনারা মেকি কান্না কাঁদছেন। আসলে এটি কমরেডদের চিরকালীন দ্বিচারিতা। ক্ষমতায় থাকলে আপনারা নৃশংসতার নজির রাখেন, আর ক্ষমতাচ্যুত হলে গরিব দরদি সেজে রাজপথ অবরোধ করে মেকি কান্নার নাটক করেন।

রেলস্টেশন বা সরকারি সম্পত্তি কোনো রাজনৈতিক দলের ভোটব্যাংক পোষার জায়গা হতে পারে না। দেশের আইন সবার জন্য সমান। নতুন সরকার ও রেল প্রশাসন যা করছে, তা সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা সহকারে এবং নাগরিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে করা হচ্ছে। আজ সাধারণ মানুষ বামপন্থীদের এই দ্বিচারিতাকে ধরে ফেলেছে। তাই রাতের অন্ধকারে অপারেশন সানশাইনের রক্তভেজা পাপ ধুয়ে ফেলার চেষ্টা না করে, আয়নায় নিজেদের আসল চেহারাটা দেখুন কমরেড! পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আপনাদের অতীত ভোলেনি, আর আজ আপনাদের এই দ্বিচারিতাকে ক্ষমাও করবে না। ▫

> **রেলস্টেশন বা সরকারি সম্পত্তি কোনো রাজনৈতিক দলের ভোটব্যাংক পোষার জায়গা হতে পারে না। দেশের আইন সবার জন্য সমান। নতুন সরকার ও রেল প্রশাসন যা করছে, তা সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা সহকারে এবং নাগরিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে করা হচ্ছে।**

ভারতের কমিউনিস্ট চরিত্র

তারক সাহা

১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর। সেদিন নিজের নিরাপত্তারক্ষীর গুলিতে প্রাণ হারান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ইন্দিরা গান্ধীর অন্যতম হত্যাকারী বিয়ন্ত সিংহকে পালটা গুলিতে মেরে ফেলা হয়। বেঁচে রইলো অপর নিরাপত্তারক্ষী সতবন্ত সিংহ এবং ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত অপর একজন কেহর সিংহ। বাকিটা ইতিহাস এবং এ নিয়ে আলোচনা এই নিবন্ধের বিষয়বস্তু নয়।

যেটা নিয়ে আলোচনা সেটা হলো এই হত্যাকাণ্ডের পর স্বাভাবিক ভাবেই ধরা হয় সৎবন্ত সিংহ ও কেহর সিংহকে। এরপর এদের বিচার হয় এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। কিন্তু কথা হলো, তখন সারা দেশের পরিস্থিতি যা গরম, বিচারপর্বে কোনো আদালতের কোনো আইনজীবী এই দুই অপরাধীর পক্ষ নিতে রাজি হলেন না। ব্যতিক্রম কেবল রামজেঠমালানি এবং প্রাণনাথ লেখি। প্রাণনাথ লেখি পিএন লেখি নামেই পরিচিত ছিলেন। আরও একটি পরিচয় তাঁর ছিল। পিএন লেখি রাজনারায়ণ বনাম ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচন মামলায় ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে লড়েছিলেন।

এনিয়ে আইনজীবী মহলে শোরগোল পড়ে যায়। এই দুই আইনজীবী কেন আসামিদের পক্ষে লড়বেন এনিয়ে প্রশ্ন ওঠে। রামজেঠমালানির যুক্তি ছিল— ন্যাচারাল জাস্টিসে বলা আছে যে, যে কোনো আসামি তার আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবে এবং এজন্য কোনো আইনজীবী তার হয়ে আদালতে মামলা লড়তে পারবেন। বিতর্ক আরও কিছুদিন চললেও রামজেঠমালানি তাঁর যুক্তিতে অনড় রইলেন।

যে মামলার বিষয়ে এতগুলি কথা বলতে হলো তার কারণ বর্তমানে একটি মামলার সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা মামলার কিছু মিল রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই রাজ্যে বর্তমান সরকার আগের তৃণমূল সরকারের যত নেতা-নেত্রী যারা তোলাবাজি-সহ একাধিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, তাদের ধরপাকড় চলছে এবং ওইসব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এমন একটা মামলা হলো রাজারহাট নির্বাচন কেন্দ্র থেকে লড়ে গতবারের জয়ী তৃণমূল প্রার্থী অদিতি মুন্সী, এবারের নির্বাচনে পরাজিত, তাঁর স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তোলাবাজি-সহ একাধিক মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন। আর সেই অভিযুক্তের হয়ে মামলা লড়বেন বলে আদালতে ওকালতনামা জমা দিয়েছেন সিপিএমের নেতা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। এই বিকাশরঞ্জন নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা লড়েছেন হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। সেই ব্যক্তি কীভাবে সেই একই দুর্নীতি এবং একই দলের নেতার পক্ষে কীভাবে আদালতে মামলা লড়তে পারেন? এখানেই মিল ইন্দিরা গান্ধীর মামলার সঙ্গে এই মামলার মিলও রয়েছে। সেখানে আইনজীবীদের যুক্তি ছিল নৈতিকতার। আর বিকাশবাবুর মিল রয়েছেও একই যুক্তি। সেদিন কেহর সিংহের হয়ে পিএন লেখিরা লড়ে যেমন কোনো অন্যায় করেননি, তেমনি বিকাশবাবুও কোনো আইনভঙ্গ করেননি। মক্কেল তাঁকে ফিজ দেবেন আর তিনি মামলা লড়বেন।

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে যদি ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হতো তবে নিশ্চয়ই কমিউনিস্টরা তাদের নৌকা তৃণমূলের তীরে গিয়ে নোঙর করতো। বিকাশরঞ্জনের দেবরাজের ব্রিফ নেওয়ার ঘটনা তা আরও একবার মনে করালো।

কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ নয়। কারণ বিকাশবাবুর আরও একটি পরিচয় রয়েছে। তিনি সিপিএমের প্রার্থী এবং তাঁর লড়াই দলগতভাবে তৃণমূল দলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে। তাঁর গায়ে যদি সিপিএমের জার্সি না থাকতো তাহলে কেউ তাঁর দিকে আঙুল ওঠাতো না। এই বিষয়ে দল তাঁর সঙ্গে নেই এবং দলের মুখপাত্র এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানিয়ে দিয়েছেন।

আসলে এটাই হলো আমাদের দেশের কমিউনিস্টদের চরিত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের পক্ষ নেওয়া, ভারত বিভাগ সমর্থন, বাষট্টি সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে এরা চীনকে সমর্থন করে। আবার ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে যখন সারাদেশ লড়ছে তখন এদের ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করা-সহ গত শতকের আশির দশকের শেষে এবং নব্বইয়ের দশকের পুরোটাই দেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একমাত্র কমিউনিস্ট শিখ নেতা হরকিষেণ সিংহ সুরজিতের দালালির ভূমিকার কথা আজও অনেকের জানা। ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে যদি ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হতো তবে নিশ্চয়ই কমিউনিস্টরা তাদের নৌকা তৃণমূলের তীরে গিয়ে নোঙর করতো। বিকাশরঞ্জনের দেবরাজের ব্রিফ নেওয়ার ঘটনা তা আরও একবার মনে করালো। আর এই কারণেই সারা দেশে কমিউনিস্টরা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। ☐

‘ককরোচ জনতা পার্টি’র কার্যকলাপে জাতীয় নিরাপত্তায় উদ্বেগ

অভিজিৎ দিপকে

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বেকারত্বের শিকার হওয়া দেশের যুব সমাজের একাংশকে ‘আরশোলা’ ও ‘পরজীবী’ হিসেবে অভিহিত করার পর তৈরি হয় বিতর্ক। প্রধান বিচারপতির ওই মন্তব্যের পর গত ১৬ মে আত্মপ্রকাশ করে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি)। দেশের সব রাজনৈতিক দলের ইনস্টাগ্রামে অনুরাগীর সংখ্যাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় সিজেপি-র হ্যান্ডলটি। নেটমাধ্যমে জন্ম নেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই ফলোয়ার সংখ্যার নিরিখে দেশের সব রাজনৈতিক দলকে পেছনে ফেলে দিয়েছে তারা। আম আদমি পার্টি সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের প্রাক্তন সহযোগী অভিজিৎ দিপকে-র গড়া সিজেপি-কে ‘জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে উদ্বেগজনক’ বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের (আইবি) রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক ‘তথ্যপ্রযুক্তি আইন, ২০০০’-এর ৬৯(এ) ধারায় সিজেপি-র হ্যান্ডলটি স্থগিত রাখতে বলেছিল এক্স (ট্যুইটার) কর্তৃপক্ষকে। আইবি রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ করা হয়। নয়াদিল্লির ওই বার্তার পর ভারতে সিজেপি-র এক্স-হ্যান্ডলটি ব্লক করা হয়। সিজেপি-র সঙ্গেই ডিজিটাল মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে একটি তথাকথিত যুব আন্দোলন— ‘ন্যাশনাল প্যারাসাইটিক ফ্রন্ট’ (এনপিএফ)। সিজেপি-র ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলটিকে সাময়িকভাবে ব্লক করে দেওয়া হলেও পরে তা তুলে নেওয়া হয়। দেশের অন্য কোনো রাজনৈতিক দলকে কোনোরকম আক্রমণ না করলেও ‘আরশোলা’র প্রতীককে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টিকে সামাজিক মাধ্যমে ক্রমাগত মিম ও প্যারোডি-ভিত্তিক আক্রমণ চালায় সিজেপি। অসংখ্য বিদেশি মদতপুষ্ট স্লিপার সেল এই মুহূর্তে দেশজুড়ে সক্রিয় রয়েছে এবং তারা যে ‘জেন-জি বিপ্লব’ ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়ায় ভারতে প্রবল অরাজকতা সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছে তা ডিজিটাল মাধ্যমে সিজেপি-র আত্মপ্রকাশের মধ্যে দিয়েই পরিষ্কার বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থাপিত হতে চলেছে ঔষধ শিল্প

রাজ্যের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত সরকার উত্তরবঙ্গে ঔষধ শিল্পের হাব (মেডিসিন হাব) গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। পাশাপাশি মালদহ, শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে আম, আনারস ইত্যাদি ফলের দ্বারা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে রাজ্য সরকার। বহু বছর ধরে দার্জিলিংয়ে চা-শিল্প ধুঁকছে। সেই শিল্পও পুনরুজ্জীবিত করতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। ২০১৪-য় ক্ষমতাসীন হয়ে ঔষধ শিল্পের ওপর জোর দেয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। অনেক জীবনদায়ী ঔষধের জন্য আমদানির ওপর এখনও নির্ভর করতে হয় দেশকে। উত্তরবঙ্গের পরিবেশ ও আবহাওয়া অনুকূল হওয়ার কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নজরে ‘উত্তরবঙ্গ’। পড়শি রাজ্য সিকিমে ইতিমধ্যেই অনেক ঔষধ শিল্প গড়ে উঠেছে। সেখানে সিপলা, ডাবর, সান ফার্মা-র মতো কোম্পানিগুলি বিনিয়োগ করেছে। পরিবর্তিত পরিবেশে এইসব কোম্পানিগুলি এরাজ্যে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে তারা আলোচনায় বসতে চলেছে।

অবশেষে পুলিশের জালে পলাতক বিডিও

পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় শুরু থেকেই জোর দিয়েছে নবনির্বাচিত সরকার। মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের সহযোগিতায় হাওড়ার তৃণমূল কংগ্রেসের কুখ্যাত নেতা শামিম আহমেদকে গ্রেপ্তার করেছে হাওড়া পুলিশ। শামিমের বাড়ির নীচে বাঙ্কার, সুড়ঙ্গের সন্ধান পায় পুলিশ। বাড়ির নীচে প্রাসাদোপম বাঙ্কার দেখে তাজ্জব হয় সংবাদমাধ্যমও। ‘হাওড়ার ডন’ বলে পরিচিত আকাশ সিংহকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তোলাবাজি-সহ নানা বেআইনি কার্যকলাপের অভিযোগে জ্যাংড়া-হাতিয়াড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রীতা গায়েনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রাজনৈতিক আন্দোলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে তৃণমূল নেতৃত্বকে ‘দুর্নীতিগ্রস্ত’ আখ্যা দিলেও আয় বহির্ভূত সম্পত্তির মামলায় রাজারহাট-গোপালপুর অঞ্চলের তৃণমূল নেতা-নেত্রী দেবরাজ চক্রবর্তী ও অদিতি মুন্সির ‘রক্ষাকর্তা’ হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে তাদের আগাম জামিনের সওয়াল করেন সিপিএম নেতা ও আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। রাজনৈতিক শত্রু মক্কেলে পরিণত হওয়ার পর বিষয়টিকে ‘পেশাগত ব্যাপার’ বলে বিকাশ ভট্টাচার্য এড়িয়ে গেলেও আগাম জামিন মেলেনি দুই অভিযুক্ত নেতা-নেত্রীর। স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যায় অভিযুক্ত, জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের প্রাক্তন বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে গত ২৫ মে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বিধাননগরে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে মদ্যপ অবস্থায় তিনি গাড়ি চালিয়ে এক পথচারীকে ধাক্কা দেন।

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৮০)

অর্থ ও ধ্যেয়

সেই সময় বিভিন্ন কার্যকর্তাকে তৈরি করে ডাক্তারজী বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাচ্ছিলেন সঙ্ঘকার্য বিস্তারের জন্য। তাদের পরিশ্রমে পঞ্জাব, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে সঙ্ঘের জাল বিস্তার হতে থাকলো। ডাক্তারজী নিজেও দিল্লি, বারাণসী গিয়ে সেখানে কাজের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। এই সময় শেঠ যুগলকিশোর বিড়লার সঙ্গে দেখা করে তাকে এক উৎসবে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি সঙ্ঘের যুক্তিপূর্ণ চিন্তা, অনুশাসনবদ্ধ কর্মসূচির বিবরণ ও কার্য বিস্তারের কথা শুনে পাঁচশো টাকা দান হিসেবে দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাবের কথা শুনে ডাক্তারজী তাকে বললেন— 'এটা দান নয়, সমর্পণ'। এ কথার পর ডাক্তারজী আর না করতে পারেননি।

১৯৩৮ সালের ২৫ মার্চ ডাক্তারজী নাসিক গিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ভোঁসলা মিলিটারি স্কুলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা। যে ট্রেনে ডাক্তারজীর যাবার কথা ছিল স্টেশনে এসে ট্রেন আসার পরে দেখলেন তাতে তিল ধারণের জায়গা নেই, মানুষ গিজ গিজ করছে, এত বেশি ভিড়ে কোনোমতেই তাতে ওঠা সম্ভব নয়। যে সমস্ত কার্যকর্তা ডাক্তারজীকে স্টেশনে বিদায় জানাতে এসেছিলেন তারা গাড়িতে ভিড়ের এই অবস্থা দেখে প্রস্তাব দিলেন, তৃতীয় শ্রেণীতে যখন এমন অভাবনীয় ভিড়, যাওয়াই সম্ভব নয়, তখন দ্বিতীয় বা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটে যাওয়া যেতে পারে। ডাক্তারজী এই প্রস্তাবে সরাসরি না করে দেন এবং সেই ট্রেনে না গিয়ে পরের ট্রেনে তিনি নাসিক যান। সঙ্ঘের আর্থিক অবস্থা তখন খুব খারাপ ছিল এবং ডাক্তারজী সমস্ত কার্যকর্তাকে মিতব্যয়ী হওয়ার জন্য বলতেন। ডাক্তারজী বলতেন যে কার্যকর্তাদের জীবনে যেন এমন দুর্ভাগ্যপূর্ণ সময় না আসে যে নিজে অন্যকে যা উপদেশ দেন তা নিজে পালন করতে অসমর্থ। 'আপনি আচরি ধর্ম' ডাক্তারজী এই নীতিবাক্যকে অনুসরণ করতেন শুধু তা নয় জীবনে অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করতে তাঁকে সবাই দেখেছে। রাত-দিন এমন কষ্ট করে তিনি তার কাছেপিঠে যে সমস্ত কার্যকর্তারা থাকতেন তাদের শেখাতে পেরেছিলেন যে সার্বজনীন অর্থের সদ্ব্যবহার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করতে হয়।

(৮১)

আত্মরূপ দর্শন

সকলের অনুরোধে ডাক্তারজী রাজি হলেন পুনায় আয়োজিত 'অখিল মহারাষ্ট্র হিন্দু যুবক পরিষদ'-এর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার জন্য। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৮-এর ১ মে থেকে ৩ মে পর্যন্ত। ৩০ এপ্রিল সকালে ডাক্তারজীর ট্রেন পুনায় পৌঁছলে স্টেশনে দেখা গেল বিপুল সংবর্ধনার আয়োজন। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যেমন— গণপতরাও নলা বড়ে, 'কেশরী' পত্রিকায় সম্পাদক জ:স: করন্দীকর-সহ শত শত তরুণ স্বয়ংসেবক। হিন্দুধর্ম ও ডাক্তারজীর জয়ধ্বনিতে প্ল্যাটফর্ম মুখরিত হয়ে উঠল। ফুলের মালায় ডাক্তারজী প্রায় ঢাকা পড়ে গেলেন। সেদিন পুনা স্টেশনে সৃষ্টি হয়েছিল এক অদ্ভুত উৎসাহের পরিবেশ। আচার্য অত্রের বাড়িতে ডাক্তারজীর ঘণ্টাখানেক অবস্থান ও চা পানের পরে সকাল আটটার সময় মন্দির থেকে শুরু হয়েছিল শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রাও ছিল বিশাল, বর্ণাঢ্য ও হৃদয় আন্দোলনকারী। প্রায় পৌনে এক মাইল শোভাযাত্রায় ছিল নানা বাদ্যযন্ত্র, রঙিন পতাকা, লেজিমের দল, সবার পেছনে বিশাল দুন্দুভির আকাশ ভরিয়ে দেওয়া আওয়াজ। ডাক্তারজীর জন্য ছিল রথের ব্যবস্থা। তিনি সেখানে পৌঁছলে প্রথমে ক্ষাত্র জগৎগুরুকে রথে বসার অনুরোধ করেন। পরে তিনি আসন গ্রহণ করেন। ডাক্তারজীর এই কৃষ্টি, পরম্পরা, শ্রদ্ধাবোধের বিষয়টি সেদিন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দুটি অশ্বের রথ ধীরে ধীরে চলছিল, পেছনে দশ বারো হাজার মানুষের সারি। সুউচ্চ ভবন অলিন্দে অজস্র চোখ শোভাযাত্রা দর্শন করছিল।

অজস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল— 'স্বরাজ্যের ক্ষুধা সুরাজ্য দিয়ে মেটে না', 'জিন্নার দাবি রদ কর' ইত্যাদি। স্থানে স্থানে পুষ্পবৃষ্টি, মাল্যদান, আরতির মধ্য দিয়ে রথ এগিয়ে চলছিল। ডাক্তারজীর হঠাৎ নজরে পড়ল এই ভিড়ের মাঝে এক খঞ্জ তরুণ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ধ্বনি দিতে দিতে লাঠিতে ভর করে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। সামনে মোড়ে অভ্যর্থনার জন্য শোভাযাত্রা থামতেই ডাক্তারজী তাকে স্নেহের সঙ্গে কোলে নিয়ে রথে বসালেন। পুষ্পমাল্য, পুষ্পবৃষ্টি সংবর্ধনা এসবের দিকে ডাক্তারজীর প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্য বা আগ্রহ ছিল না। লৌকিকতার প্রয়োজনে তিনি ওগুলো গ্রহণ করছিলেন। তিনি তো খুঁজছিলেন এত শত শত তরুণের ফুলের মালা ধরা হাতগুলো রাষ্ট্র সেবায়, রাষ্ট্ররক্ষায় কবে বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে, অভ্যর্থনার আনুষ্ঠানিক আবেগে আপ্লুত হৃদয়গুলি কবে দেশভক্তির ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। খঞ্জ তরুণকে শুধু মমত্ব সহানুভূতি বোধের কারণে তুলে নিয়েছেন তাই নয়, আসলে তার মধ্যে ছিল সমগ্র হিন্দু সমাজের দুর্বল রূপটি। তার আত্মার বর্তমান প্রকৃত রূপটি দর্শন করেছিলেন তিনি। তাই দুহাত প্রসারিত করে তাকে তুলে ধরেছেন। মনে ভাবনা ছিল এই দুর্বল হিন্দু সমাজকে কীভাবে স্বাবলম্বী, নির্ভীক, পরাক্রমী করে গড়ে তোলা যায়। তিনি তার জন্য সব করতে প্রস্তুত, খঞ্জ ব্যক্তির প্রতি তার এই সক্রিয়তা ছিল পরাধীন হিন্দু সমাজকে তুলে ধরে জাগ্রত ও শক্তিশালী করার এক প্রতীক চিহ্নমাত্র।

সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস